New Zealand **Sarbojonin**
DURGOTSAV 2018

organised by
Probasee Bengalee Association

Eco Travels

24 HOURS 0272 16 17 18
ecotravels.co.nz

Cheapest Airfares.

Affordable packages
&
Unmatched Cruise Deals
Explore World with us

শুভ শারদীয়ার

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

27th NZ Sarbojonin Durgotsav 2018

Since 1992

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Venue: NZ Athia Trust Society
37-39 Selwyn St, Onehunga
Auckland 1643

PUJA PROGRAMME 2018

Friday 19 October

7 pm	Pratima Sthapan and Pujo
8:00 pm	Cultural programme
9:15 pm	Dinner

Saturday 20 October

10:30 am	Mahashashthi Puja
11:30 am (in parallel)	Sit and Draw competition followed by Quiz Challenge
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Mahasaptami Puja
3 pm	Arati/Pushpanjali
7:15 pm	Sandhyarati
7:45 pm	Cultural Programme
9:15 pm	Dinner

Sunday 21 October

10:30 am	Mahashtami Puja
11:30 am (in parallel)	Go As You Like competition (children and adults)
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Sandhi Puja
1:45 pm	Mahanavami Puja
2:00 pm (in parallel)	Talent Quest (6- 18 years)
3:15 pm	Arati/Pushpanjali
3:30 pm	Havan
7:00 pm	Dasami Puja
8 pm	Sindur Daan
9 pm	Dinner

On behalf of:
Probasee Bengalee Association of NZ Inc.
www.probasee.org.nz

CONTENTS

Bibekananda-r Bishwajay [বিবেকানন্দর বিশ্বজয়]	Amit Sengupta	7
Unishe May Shesh Noy [উনিশে মে শেষ নয়]	Dibyendu Bhattacharya	11
Technology - Gadgets	Krishna Bannerjee	13
Facebook	Swapna Roy	14
Europe-er Diary [ইউরোপের ডায়েরি]	Shahin Haque	17
Chicken-mushroom Recipe	Sudeshna Chatterjee	20
Two Poems	Sananda Chatterjee	22
Railpremik Satyajit [রেলপ্রেমিক সত্যজিৎ]	Bhaskar Bose	23
Bonedi Barhir Durga Puja [বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা]	Tapas Kumar Mandal	29
This Happened...	Krittibas Dasgupta	35
Durga Pujo	Emili Biswas	36
Sharatchandra [শরৎচন্দ্র]	Amit Sengupta	37
Amar Sundarban [আমার সুন্দরবন]	Sudeshna Chatterjee	44
Probasee Annual Events (Photo Gallery)		45
Kobitaguchho [কবিতাগুচ্ছ]	Swastika Ganguly	47
India 1970s	Shopan Dasgupta	49
Amar Durga [আমার দূর্গা]	Soham Sarkar	55
Bandhu [বন্ধু]	Rani Aklima	56
Jhilik [ঝিলিক]	Sudeshna Giri	56
Salil Choudhury O Sudhin Dasgupta [সলিল চৌধুরী ও সুধীন দাশগুপ্ত]	Krittibas Dasgupta	57
That was summer	Shinjini Dutta Choudhury	61
That's Where I'll Find You	Shinjini Dutta Choudhury	62
Mrityur Sarani Diye [মৃত্যুর সরণী দিয়ে অমৃতের আরাধনা]	Sanjay Bannerjee	63
উদাসী মন	Partho Sengupta	73
ক্যানভাস	Partho Sengupta	74
Mayer Jonmo [মায়ের জন্ম]	Sudip Biswas	75
Bangali Rannar Tin Kahon [বাঙালি রান্নার তিন কাহন]	Sumitra Gupta	76
Bajlo Tomar Alor Benu [বাজলো তোমার আলোর বেনু]	Swapna Roy	78
অনন্ত আহ্বান	Karabi Bagchi	81
Memorable experiences on Bombay's Local Train	Pavitra Roy	91

Paintings

Shanta Basu Arup Ghosh
Raunak Giri Srijan Baag

From the President's desk

প্রবাসী পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেলো, মা আবার এলেন আমাদের সবার জীবনে আলো আর আনন্দ ছড়িয়ে দিতে।

Greetings and Best wishes on behalf of the Executive committee of Probasee Bengalee Association, on this annual festive occasion of Durga Puja.

As a background, according to legend, Durga ("the inaccessible" in Sanskrit) was created for the slaying of the Buffalo demon Mahishasura by Brahma, Vishnu, Shiva and the lesser gods, who were otherwise powerless to overcome him. Durga therefore embodies their collective energy (shakti) as a true source of their inner power. Goddess Durga is depicted riding a lion, with 8 or 10 arms, each holding the special weapon of one of the gods, given to her for her battle against the Buffalo demon. Durga Puja, held annually in her honour, is one of the great festivals of North East India. The festival is held traditionally for 10 days in the month of Ashvina, the 7th month of the Hindu calendar. Durga Puja's first day is Mahalaya, which heralds the advent of the goddess. Celebrations and worship begin on Sasthi, the 6th day. During the following 3 days, the goddess is worshipped in her various forms as Durga, Lakshmi, and Saraswati. The celebrations end with Vijaya Dashami ("10th day of victory") when idols are carried in huge processions to local rivers, where they are immersed. That custom is symbolic of the departure of the deity to her home and to her husband, Shiva, in the Himalayas.

Probasee Bengalee Association is proud to hold this annual festival for the 27th year in succession, a festival of immense importance to members of the Bengalee community and a wonderful example of the community coming together in celebration. During the 3 days the festival is held here in Auckland, community cooking is done at the venue and main meals served to all present. It is an opportunity for the community to celebrate their culture and traditions, with singing and dancing programmes organised during the evenings showcasing their culture and talents.

Best wishes again on this great festive occasion

Pratap Banerjee
President
Probasee Bengalee Association

সম্পাদকীয়

খুব ছোটবেলা থেকে আমাদের মনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে গেছে যে উৎসব, সেই দূর্গা পূজা এখন প্রবাসেও আমাদের শিকড়ের টান অনুভব করায়। মহালয়ার দিন এলেই, মনে একটা খুশির আমেজ এসে যায়, যদিও এখানে বেরিয়ে দেখি না সুসজ্জিত মানুষের বন্যা, রাস্তায় রাস্তায় নেই আলো-ঝলমল দোকানের সারি। তাতে কি এসে যায়? জীবনের তীব্র পরিবর্তনের স্রোতেও সুদৃঢ় অবলম্বনের মতো দূর্গা পুজো আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।

এই কয়েকটি দিনের আনন্দ আমাদের সারা বছরের বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, এমনকি খাদ্য বৈচিত্রের মাপকাঠিতেও আমাদের সবাইকে অনেক সমৃদ্ধ কোরে তোলে। পুজোর গান যখন প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে দিনভর বাজতো, তখন কি বুঝেছিলাম, যে ভারতবর্ষের সবচাইতে কালজয়ী গানের ভান্ডার আমাদের কাছে তখন উন্মুক্ত? হামলে পড়ে যখন আনন্দমেলা আর শারদীয়া সন্দেশ পড়েছি, তখন এক বারও মনে হয়নি, এ তো হুজুগ মাত্র। উঁচু মানের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তো দূর্গা পুজোর দৌলতেই আমাদের চেনাশোনা শুরু। প্রবাসীর তরফ থেকে এবারেও পরিবেশন করা হলো আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার ফসল,এই শারদ সংকলন।

আশা করি এবারের পুজোও সবাইকে অঢেল আনন্দ এনে দেবে। ছোটো, বড়, গুরুজন, সবাইকে জানাই পুজোর অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সবাই ভালো থাকবেন।

সম্পাদক মন্ডলী

কৃত্তিবাস দাশগুপ্ত
সিদ্ধার্থ রায়

বিবেকানন্দের বিশ্বজয়

অমিত সেনগুপ্ত
(অকল্যান্ড)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার এবং তাঁর চিন্তার বীজ বিশ্বব্যাপী বপন করার ও ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর যে মহান ও প্রধান শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেহ ও মনের দিক থেকে ঠাকুরের ঠিক বিপরীত। ছোট বয়স থেকেই বিবেকানন্দ, অর্থাৎ তখনকার নরেন, দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। এ দম্ভ রামকৃষ্ণের সামনেও অনেকবার প্রকাশ পায়। তাই সেই সময় মাঝে মাঝে ঠাকুরকেও ভালবাসার সুরে বলতে শোনা গেছে "আরে লরেন (তিনি লরেন বলতেন, নরেন নয়) আমাকে পর্যন্ত মানতে চায় না।" তবে তখনই তিনি এও বলেছিলেন--"লরেন যেদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের স্পর্শে আসবে, ওর এই দম্ভ করুণায় বিগলিত হবে, ওর সব আত্মবিশ্বাস অন্যের হতাশ ভীরু আত্মার মধ্যে বিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনবার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।"

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বরানগরের মঠে কয়েক মাস তাঁর শিষ্যরা পরস্পরের মানসিক উন্নতি সাধনে অতিবাহিত করলেন। তখন তাঁরা কেউই মানুষের কাছে ঠাকুরের বাণী পৌছে দেবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন না। প্রথম কয়েক মাস তাঁরা মুক্তির সন্ধানে ধ্যান-ধারণার মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন। নরেনের কাছে স্বপ্ন ও কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই তিনি গুরুভাইদের শুধু নিষ্ক্রিয় ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হতে দিলেন না, কাউকেই ভগবৎ-চিন্তার আলস্যে গা ঢালবার সুযোগ দিলেন না। যদিও রামকৃষ্ণর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা প্রথম থেকেই তাঁর গুরুভাইদের পথ দেখাবার অধিকার দিল। সাধে কি ঠাকুর বিদায়কালে নরেনকে বলেছিলেন, 'এদের দেখিস'। আর অসুস্থতার শেষ দশায় কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নড়বড়ে হাতে লিখেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন দূরে বাহিরে হাঁক দিবে'।

নরেনের কোন সন্দেহই ছিল না যে এক মহান কর্তব্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ১৮৮৮ সালে হঠাৎ তিনি কোলকাতা ত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। এর পরও তিনি আরও কয়েকবার এইভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণে যান, দেশটাকে ভালভাবে দেখে-বুঝে নেওয়ার জন্যে। এই পরিভ্রমণের বর্ষগুলো ছিল শিক্ষালাভের বর্ষ। অপূর্ব শিক্ষা। তিনি দীন-দরিদ্রের মধ্যে থেকে তাদের জীবনে অংশ গ্রহণ করেছেন, জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখলেন মানুষের মধ্যে ভগবান কীভাবে সংগ্রাম করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেও এ শিক্ষা পাওয়া যায় না। ঠাকুরের সঙ্গে থেকে এই শিক্ষা আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবে যেন স্বপ্নের মতই পেয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের সাথে মিশে তাদের দৈন্য ও লাঞ্ছনায় অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময় তিনি কিছুদিন একটি পতিত মেথর পরিবারে বাস করেন। এসব মানুষ, যারা সমাজের নিচে নত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদের

সন্ধান পেলেন। তাদের দুঃখদৈন্য ও দুরবস্থা তাঁর শ্বাসরোধ করল। তিনি কেঁদে উঠলেন, "ওরে আমার দেশ! আমার দেশ!..." নিজের বুক চাপড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি সন্ন্যাসী, আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এদের জন্য কি করেছি?" ঠাকুরের কথা মনে পড়ল, "ওরে, খলি পেটে ধর্ম হয় না!"

ধর্মের আত্মসর্বস্ব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিবেকানন্দের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ধর্মের প্রথম কর্ত্তব্য ঘোষণা করলেন, "দীনদুঃখীর যত্ন করো, তাদের সেবা করো, তাদের অবস্থার উন্নতি করো।" এর দায়িত্ব, তিনি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত, ধনী, রাজকর্মচারী, রাজামহারাজ সকলের উপর ন্যস্ত করলেন, "আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যিনি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে পারেন? বেদান্তপাঠ ও ধ্যানের সাধনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখুন! এ শরীর অপরের সেবায় উৎসর্গ করুন। তা হোলেই জানব আপনারা বৃথা আমার কাছে আসেন নি। মনে রাখুন সর্ব জীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানকেই আমি বিশ্বাস করি। এরাই আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য বার বার আমি জন্মিতে পারি। এদের সেবাই ভগবানের প্রকৃত সেবা। সত্যিকারের ধর্ম করতে যদি চান তো এদের সেবা করুন।"

বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, "আমি এমন একটা ধর্ম চাই যা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দেবার, আমাদের চতুর্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করবার শক্তি এনে দেবে। যদি ভগবানকে পেতে চাও তো দরিদ্র মানুষের সেবা করো। তাহারা হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই জনসাধারণই তোমাদের ভগবান হইয়া উঠুক। যতদিন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অজ্ঞানতায় থাকিবে ততদিন প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব - কারণ তাহারা দরিদ্রের অর্থে নিজেদের শিক্ষিত করিয়াছে, অথচ দরিদ্রের প্রতি তাহাদের বিন্দু মাত্র লক্ষ্য নাই। "

১৮৯২ সালের পরিভ্রমণে, সারা ভারতময় যে দুঃখ-দুর্দশা বিবেকানন্দ দেখলেন, তাইই তাঁর সমস্ত মন জুড়ে রইল, সেই মনে আর অন্য কোনও চিন্তা রইল না। বাঘ যেমন শিকারের সন্ধান করে, তিনিও ঠিক সেইভাবে এর সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সেই মুহূর্ত্ত থেকে দীন-দুঃখী মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর দেহ ও আত্মাকেও উৎসর্গ করলেন। কিন্তু নিঃস্ব সন্ন্যাসী তিনি, কিভাবে এদের সাহায্য করতে পারেন? ভাবলেন দু-চার-দশজন যে পরিচিত রাজা মহারাজা আছেন, তাঁদের দান দিয়ে এই প্রয়োজন মিটবে না। তখন তিনি কন্যা-কুমারিকায়। তাকালেন বিশাল সমুদ্রের দিকে, তাকালেন সমুদ্রপারের দেশগুলির দিকে। স্থির করলেন সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি আবেদন জানাবেন। ভারতকে যে সমস্ত বিশ্বেরই চাই।

১৮৯২-এর শেষ দিকে বিবেকানন্দ শুনলেন যে আগামী বছর শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলন হবে। আসবেন সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ। শুনেই তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করলেন যে যেভাবেই হোক তাঁকে সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু যাবেন কি ভাবে? তাঁর পরিচিত ধনী ব্যাঙ্কের মালিক ও রাজা মহারাজারা টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু সে টাকা তিনি নিলেন না। তিনি বললেন, "আমি জনসাধারণ ও দীন-দুঃখীর পক্ষ থেকে যাচ্ছি।" তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের (যারা অর্থ সংগ্রহ করছিলেন) বিশেষভাবে মধ্যবিত্তের কাছেই আবেদন করতে বললেন। অর্থও সংগ্রহ হোল।

এর পর ৩১শে মে বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়লেন। এই যাত্রার সময় থেকেই তিনি তাঁর লাল রেশমের পোশাক ও গেরুয়া পাগড়ী ব্যাবহার করতে থাকেন। এই সময়ই তিনি বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করেন। নামটি তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজা দেন। ভারত ভ্রমণকালে তিনি ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম গ্রহণ করতেন, যাতে লোকচক্ষে ধরা না পড়েন। ১৮৯২ সালে পুনাতে বাল গঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে তিনি দশদিন ছিলেন। কিন্তু তিলক তাঁর নাম জানতে পারেন নি।

জুলাইয়ের শেষের দিকে বিবেকানন্দ শিকাগো পৌঁছে শুনলেন, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে ধর্ম-সম্মেলন শুরু হবে। তা ছাড়া প্রতিনিধি হিসাবে নাম লেখাবার তারিখও অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচয়পত্র না থাকলে নাম লেখান চলবে না। তিনি কোনো অনুমোদিত দলের সুপারিশ নিয়ে আসেন নি। তাছাড়া টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ হতে চলেছে। যে কটা ডলার তাঁর সঙ্গে ছিল, তা খরচ করে তিনি অপেক্ষাকৃত সস্তা শহর বোস্টনে গেলেন।

বিবেকানন্দের মত লোক কখনও লোকের নজরে না পড়ে পারেন না। বোস্টনে যাবার সময় ট্রেনে তাঁর চেহারা আর কথাবার্তা এক ধনী বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে মুগ্ধ করল। তিনি বিবেকানন্দকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং হার্ভার্ড

ইউনিভারসিটির অধ্যাপক জন রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যাপক রাইট এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে অবাক হলেন। তিনি সব রকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি এই কপর্দকশূন্য তরুণ সন্যাসীকে শিকাগো যাবার রেলের টিকিট কিনে দিলেন ও থাকবার জায়গা ঠিক করে দেবার জন্য কমিটির প্রেসিডেন্টের (যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন) কাছে চিঠি লিখে দিলেন। এছাড়া নিজের তরফ থেকেও কয়েটি পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন "তোমাদের সম্মেললেন সমস্ত প্রতিনিধিদের জ্ঞানের সমষ্টি যদি একটা প্রদীপের আলোর সমান হয়, তবে এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান সূর্যের সমান।" প্রফেসর রাইটের কথা মিথ্যে হয় নি।

অনেক রাত্রে বিবেকানন্দ শিকাগো স্টেশনে পৌঁছলেন। রাত্রে কোনভাবে স্টেশনে কাটিয়ে, সকালে ক্লান্ত হয়ে তিনি পথে বসে পড়লেন। পথের ওপারের এক ভদ্রমহিলা তাঁকে লক্ষ্য করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সম্মেলনের কোন প্রতিনিধি কিনা। বিশ্রামের পর তিনি তাঁকে সম্মেলনের অফিসে নিয়ে গেলেন। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকানন্দ সাদরে গৃহীত হলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল। সমস্ত প্রতিনিধিদের ঠিক মাঝেখানে বসে আছেন কার্ডিনাল গিবসন, যিনি এই ধর্ম-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে বসে আছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। বিবেকানন্দ বিশেষ কারও প্রতিনিধিত্ব করতেও আসেন নি - আবার সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। তিনি ভারতের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি। হাজার হাজার উপস্থিত দর্শকের দৃষ্টি এই সুদর্শন, বলিষ্ঠ, তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপর পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য ও মহিমা, তাঁর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার শুরুতেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করল। তাঁর সুন্দর মুখ-মন্ডল, সমুন্নত দেহ, পোশাক – সবকিছুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই ধরনের সভায় বিবেকানন্দ এই প্রথম বলতে এসেছেন। একে একে সব প্রতিনিধিরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। বিবেকানন্দ লিখিত কোন কিছুই নিয়ে যাননি। সব শেষে তাঁর পালা আসলে তিনি উঠলেন। দুই হাত বুকের সামনে রেখে (যা তাঁর বিখ্যাত ছবিতে দেখা যায়) সম্বোধন করলেন, 'সিস্টারস্ এন্ড ব্রাদারস্ অফ আমেরিকা' বলে।

বক্তৃতার শুরুতে এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সমবেত সাত হাজার শ্রোতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। সেই হাততালি চলল মিনিট দুই। তার পর বিবেকানন্দের বক্তৃতা চলল বেশ কয়েক ঘন্টা - সন্ধ্যে পর্যন্ত। তাঁর সেই বক্তৃতা ছিল যেন অগ্নি-শিখা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে ধর্ম বরাবর পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত পার্থক্য স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, সেই ধর্মভূক্ত বলে আমি গৌরব বোধ করি। আমরা সব ধর্মকেই স্বীকার করি। শুধু তাই নয় সব ধর্মই আমাদের চোখে সমান সত্য।..... ইংরাজী exclusion শব্দটিকে যে ধর্মের ভাষায় (মানে সংস্কৃতে) অনুবাদ অবধি করা যায় না, সেই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত মানুষ বলে আমি গর্বিত।" এর পরে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে "পৃথিবীর সব ধর্মের, সব জাতির পীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে চিরকাল অকাতরে বুকে টেনে নিয়েছে, সহায় ও শরণ দিয়েছে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু ধর্ম। ইহুদি ও পারসীরা তাঁদের ধর্মে আক্রমণকারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে। আমি গর্ব অনুভব করি এমন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে। ..... আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হোক। প্রভুর জয় হোক।"

প্রফেসর রাইট যে মিথ্যা বা ভুল বলেন নি, উপযুক্ত কথাই লিখেছিলেন তার প্রমাণ স্বামীজী দিলেন। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, "অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল।" শিকাগোতে এই সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের সভায় মাত্র ত্রিশ বছরের বিবেকানন্দই ছিলেন সর্ব-কনিষ্ঠ প্রতিনিধি। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত-পরিচয় এই তরুণ সন্ন্যাসীর আত্মপ্রকাশে অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। অন্যান্য বক্তারাও কিন্তু সবাই ভগবানের কথাই বলেছিলেন - কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভগবান। স্বামী বিবেকানন্দই কেবলমাত্র একা সকলের ভগবানের কথা বললেন, সকলের ভগবানকে বিশ্ব-সত্ত্বায় মিলিয়ে দিলেন। এ ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তা তাঁর মহান শিষ্যের মুখ দিয়ে নির্গত হোল। বিবেকানন্দ বললেন, "খ্রীষ্টানকে বা মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হোতে হবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রীষ্টান বা মুসলমান হোতে হবে না। সবাই অপরের অধ্যাত্ম আলোক অধিগত করবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না, বিকাশের মূলনীতি অনুসারে সকলেই

বিকাশ লাভ করবে। প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে "সাহায্য করো সংগ্রাম নয়, গ্রহণ করো ধংস নয়, লিখিত থাকবে - মতানৈক্য নয় মতৈক্য ও শান্তি।" তাঁর বক্তৃতা শুনে সম্মেলনে উপস্থিত এক ইহুদী ধার্মিক পণ্ডিত মন্তব্য করেন, "স্বামীজির বক্তৃতা শোনার পর জীবনে প্রথমবার আমার মনে হল আমার ইহুদী ধর্মও সত্য, এবং তারপর থেকেই আমি আমার ধর্মকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করতে শিখি।"

এর পরবর্তী কয়েকদিনে বিবেকানন্দ আরও দশ-বারো বার বক্তৃতা দিলেন। তিনি মঞ্চে উঠলেই, বক্তৃতা শুরু হবার আগেই শ্রোতারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উঠতেন। সম্মেলনের অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের উৎসাহের ভাটা পড়তে দেখলেই শ্রোতাদের শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রাখার জন্য বলা হত বিবেকানন্দ শেষে বক্তৃতা দেবেন। সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি এসেছিলেন, বিবেকানন্দের কথাগুলি তাঁদের ডিঙিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উচ্চারিত হল যা অন্য ধর্মের অনেক লোকেদেরও আবেদন করল। বিবেকানন্দের খ্যাতি অচিরেই দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

সমস্ত মার্কিন সংবাদপত্র একবাক্যে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিবেকানন্দকেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকার ও ঘোষণা করল। বলল, 'তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর ভারতের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ তা আমরা অনুভব করলাম।'

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারায় যে ভাবের কাজ চলছিল, তার ফলে পাশ্চাত্যের অন্যন্য যে কোনো দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রচার শুরু করতে না করতেই তাঁর বাণী শোনার জন্য তৃষ্ণার্ত নরনারী তাঁর চতুর্দিকে ভীড় করে আসলো। তারা চারিদিক থেকে আসতে লাগল। এলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা, এলো অকপট শুদ্ধচেতা খ্রীষ্টানরা, স্বাধীনচেতা মনীষীরা, এমন কি সংশয়বাদীরাও।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, "তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সকলেই প্রথম দর্শনেই তাঁর মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পেত। তাঁর মধ্যে নির্দেশ দেবার, পরিচালিত করবার যে শক্তি ছিল তা সকলের চোখেই ধরা পড়ত।"

এর পরের ঘটনা বা ইতিহাস আমরা জানি। অথচ, স্বামীজীকে কতটা সম্মানই বা আমরা দিয়েছি। তাঁর জীবিত অবস্থায়, যে দক্ষিণেশ্বর তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় তীর্থস্থান, সেই দক্ষিণেশ্বর-মন্দির তাঁর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তিনি সমুদ্র পার হয়েছিলেন, সাহেবদের সাথে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। আর, তিনি কি করেছেন আমাদের জন্যে? গোটা জাতিটাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। শুধু জাগিয়েই তোলেন নি, পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের জন্যে একটা সম্মানের আসন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "If you want to know about India, study Vivekananda." আর এ সব উনি করেছেন সেই যুগে, যখন বিদেশীরা তো বটেই, আমরা নিজেরাই ভারতবর্ষকে ছোট চোখে, ঘৃণার চোখে দেখতাম। ধর্মের বেড়া তাঁকে চিন্তিত করবে এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তাই তিনি এই মহান সত্য ঘোষণা করেছিলেন, "কোনো একটি ধর্মের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু কোনো একটি ধর্মের মধ্যে মরা - সে ভয়ংকর।"

উনিশে-মে শেষ নয়

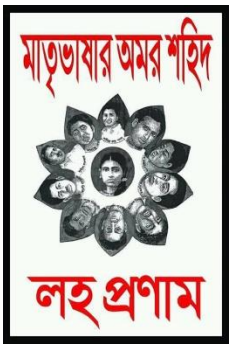

একটি গাছের কুঁড়ি অন্য গাছে কখনও ফোটেনা
এসব প্রবাদ-কথা উল্টেও তো যায়-

যেখানে মনের মাঝে একাত্মতা থাকে

সেইখানে গাছকলমের মতো স্থিতি আসে

কুঁড়ি ফোটে

সাক্ষী গাছেরাও রুদ্ধ-শ্বাস থেকে ফিরে এসে

হাততালি দিয়ে নীরব আলাপে মেতে ওঠে

তাই কিছু মানুষও স্বস্তি পায় , তারা উৎসাহে

রেনেসাঁস ভেবে ছুটে যায়-

এভাবেই একদিন গোষ্ঠীবদ্ধতার

শিল্পীত স্বভাবে তারা আন্দোলিত হয়

এখানে তো কেউ বন্য কেউ যে পোষাকি তাও নয়

তবু যে মুখের বুলি কেড়ে নেওয়া চাই-

কে বিদেশি কে স্বদেশি এইসব কূট-চাল

হৃদয়ে হৃদয় নিয়ে আসে না তো-

উনিশে-মে শেষ নয় , আরও কত শহিদের

পরম্পরা ছাপা হয় ইতিহাসে...

পুরুষানুক্রমে লেখো নাম , তোমার আমার

নাম এন-আর-সির চাহিদানুসারে

যতদিন থাকবে জীবন , বারবার

লাশকাটা ঘরে দেহ কাটাছেঁড়া করে

ময়না-তদন্তে তার সারাৎসার নিয়ে

গবেষণা হবে

তুমি আদি-বাসী ছিলে কি না ; ওরা ভাবে বুঝি

এ-ভূমিটা বাসযোগ্য ছিল না তখন !

আসামে তো ওরা অন্য গাছে কুঁড়ি ফোটাতে দেয়না –
সাক্ষী ইতিহাস , সাক্ষী থাকে গাছ-নদী

আর , সাক্ষী মানুষেরা যারা দ্রুত ভুলে যেতে চায় ।

----------দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য----------

FIRST property management

M 021703567 P 09 2148544 www.rentalsinauckland.co.nz

If you want a good tenant, talk to us.

Special Offer

If you have a rental property, receive a $60 rental appraisal, absolutely free.
$500 off your first year's fees if you sign up for our management service.

The First Property Management customer experience...

It is refreshing to find someone like Mohijit who is honest, courteous, reliable and always reachable. He has been managing our property for the past 10 years and has treated our home as his own. We wish him all the best and look forward to working with him for many years to come.

R K, Melbourne

Being new landlords we were very nervous in the beginning, not sure of how we would manage the whole process. Mohijit made the whole transition easy and seamless and put our minds at ease. Mohijit is very easy to deal with and very organised. Highly recommend.

Chiradeep and Sonali Banerjee
Auckland

Your peace of mind is our business

Technology—Gadgets

Bane or Boon?

Technology has taken over almost every aspect of our lives especially children who are not left untouched by the growing craze of the latest gadgets and apps. The children are absorbing knowledge with these devices without having cognitive thinking to distinguish good and bad. Is this a bane or a boon?

It all began with small apps and now these gadgets and apps have taken over almost every minute of our lives.

Finding a child with an ipad or tab in their hand is not an unusual sight these days,communication with the outside world is limited by these gadgets .Sometimes it can be a boon as it helps in keeping you updated with the latest happenings. But the question is where to draw the limit?

Nowadays school kids have less books to carry in the bags which of course is a blessing as their studies are all done through the internet.

From early childhood they are taught to sing learn colors phonetics on pronunciation but is this all necessary from such a tender age. Long before the invention of these gadgets students learnt everything from practical to physical through natural surroundings .

Now we live where the impact of science and technology is huge . we have cell phones ,ipad, tablets ,laptop which were not in existence in the 60's .We think these gadgets benefit us but it's a wrong conception , continuous use of these gadgets makes one addictive which may cause not only physical but mental illness in the long run. So the question remains the same. Is electronic gadgets a boon or bane?

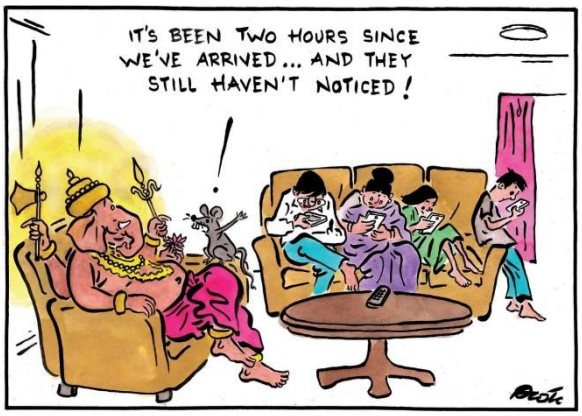

The answer depends upon how we use them. We can use them as a boon if we use them appropriately and it can be a bane if we misuse it.

An article written by Krishna Banerjee

ফেসবুক f

আজকাল একলা বসে থাকলেই ছোটবেলার দিন গুলি মনে পড়ে যায়। সেই স্কুলের দিন বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া - পড়া, খেলা, আড়ি, অভিমান; ঘরে ফিরে মায়ের আদর, ঘুম, আহা কি সুন্দর জীবনটা ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন বদলায়, ভালো লাগা - না লাগা বদলায়। সমাজ বদলায়। মানুষের জীবনধারাও বদলায়। ছোটবেলার স্কুলের জীবন শেষ করে কলেজের জীবন শুরু হলো, কিন্তু স্কুলের দীর্ঘ জীবন আমার কাছে Golden Period । ছোটবেলার বন্ধুরা কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো সব, তাদের আর দেখা পেলাম না, ফিরে পেলাম না। তাদের কথা ভেবে আজও আমার মনটা ছটফট করে।

আমার নিজের জীবনের কত পরিবর্তন এসেছে - মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখে চশমা, কপালে বলিরেখা, হালকা শরীর দিন-দিন ভারী হতে থাকা, নানা অসুখের আসা-যাওয়া, জীবনে চলার পথে অনেক দুঃখ-আঘাতের অভিজ্ঞতা। যখন যেখানে গিয়েছি মনটা কেবলই অস্থির হতো - আহা, ছোটবেলার সাথী কাউকে যদি পেতাম ! গতবছর আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম, 'আলাস্কা' পর্বতমালা দেখতে, যেটা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, সেখানে ছয় মাস দিন - ছয় মাস রাত্রি থাকে, অপূর্ব সে দৃশ্য।

জাহাজের ডেকে বসে মুগ্ধ হয়ে মনোরম সে দৃশ্য দেখছিলাম আর গুন্-গুন্ করে গাইছিলাম 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না সেই যে আমার নানা রঙের দীনগুলি' । হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন 'বাঃ , চমৎকার গান শুনলাম। ' আমি ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে বসতে বললাম, তারপর নানা কথার পর জানতে পারলাম তাঁর নাম অরুনাভ, আমার কলেজের ছাত্র, এক বছরের senior ছিলেন। অরুণাভকে বললাম,' পুরোনো বন্ধুদের খুঁজছি - কি করে খোঁজ পাবো? ' 'আরে আজকাল তো কোনো সমস্যাই নেই, যাকে খুঁজছো বা যাদের খুঁজছো, ipadএ ফেসবুকে নাম টাইপ করে দেখো নিশ্চই তোমার প্রিয় বন্ধু বা বন্ধুদের খোঁজ পাবে - তারা কেউ হারিয়ে যায়নি .....'

স্বপ্না রায়

Artist: ***Arup Ghosh***

roop darshan
SOUL OF INDIAN FASHION

1 White Swan Rd, Mt Roskill, Auckland
221 Great South Rd, Papatoeote, Auckland
www.roopdarshan.co.nz

Harcourts

Suresh RRK
Sales & Marketing Consultant
M **021 109 5336** P **09 629 4809** F **09 620 9900**
suresh.rrk@harcourts.co.nz

V & B Realty Ltd Licensed Agent REAA 2008
1480 Dominion Road, PO Box 49101,
Mt Roskill South, Auckland 1041, New Zealand

www.harcourts.co.nz

ইউরোপের ডায়েরি
শাহীন হক

১
পাথরের দেয়াল ঘেঁষে একটা কবুতরের বাচ্চা অনেক্ষন ধরে ওড়বার চেষ্টা করছে। বাচ্চাটা মাত্র উড়তে শিখেছে বলে Bosphorus এর দিক থেকে আছড়ে পড়া বাতাসের ধাক্কায় বেশি দূর যেতে পারছে না। ডানা মেলে কিছুটা ওঠবার পরেই বেচারা আবার ধপাস করে শক্ত পাথুরে চাতালের ওপর আছড়ে পড়ছে। গত দশটা মিনিট ধরে একদৃষ্টিতে Mimar Sinan তাকিয়ে তাকিয়ে বাচ্চা কবুতরের এই আপ্রাণ চেষ্টা দেখছেন। প্রধান স্হপতি Mimar এর মনটা আজ একেবারেই ভালো নেই। উনি বসে আছেন Topkapi প্যালেসের উত্তর দিকের চাতালে ঢুকবার সিঁড়িটার একেবারে ওপরের ধাপটায়। অন্যদিন হলে Mimar উঠে গিয়ে কবুতরটাকে উড়তে সাহায্য করতেন, কিন্তু এমুহূর্তে Mimar এর কোনো কাজেই আগ্রহ নেই।

দূরের Golden Horn এর পানিতে সূর্যের আলো পড়ে কেমন এক অপার্থিব রূপ ধারণ করেছে। আর সেদিকে তাকিয়ে Mimar এর মনে হচ্ছিলো - তার গত তিরিশ বছরের এত সব পৃথিবী বিখ্যাত স্থাপত্যের কাজ - এর কি কোনোই জাগতিক মূল্য নেই !! উনি হেরে গেলেন Rüstem Pasha র কাছে। Mihrimah কে পাবার সব সম্ভাবনাই আজ শেষ হয়ে গেলো। পশ্চিমের প্রাসাদে চলছে এখন Mihrimah র বাগদান অনুষ্ঠান। বলকান অঞ্চলের একঝাঁক ঘোড়সওয়ার নিয়ে Rüstem Pasha এসেছেন Mihrimah কে হীরের আংটি পরিয়ে দিতে। সুলতান সুলায়মান আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার অতি প্রিয় স্থপতিকে এ বিশেষ অনুষ্ঠানে। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে Mimar এখন পশ্চিম প্রাসাদ থেকে অনেকটাই দূরে।

একই আকাশে কি সূর্য্য এবং চাঁদ এমসঙ্গে দেখা যায় ! ইস্তাম্বুল এর স্বচ্ছ নীল আকাশে দিনের বেলায় এ দৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু এর মাঝে একধরণের অনন্যতা খুঁজে পাওয়া যায় - ইংরেজিতে যাকে বলে uniqueness। অটোমান সুলতান Suleiman the Magnificent যখন তার মেয়ের নাম রেখেছিলেন Mihrimah - যার অর্থ ফার্সিতে সূর্য্য এবং চাঁদ - তখন সুলতানের মাথায় নিশ্চই নিজের মেয়েকে অনন্য করবার এক তীব্র ইচ্ছে কাজ করেছিলো। মেয়ে অবশ্য বাবাকে একেবারেই নিরাশ করে নি। Mihrimah তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের আর দশটা রাজকন্যার মতন ছিলেন না। বাবা সুলতান সুলায়মান এর সাথে Mihrimah রাজ্যের রাজনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক সব কাজেই ছিলেন নীতি নির্ধারণের দায়িত্বে। এমন একজন বিদুষী ক্ষমতাধর নারীর গুণগ্রাহীর অভাব থাকবার নয়। লোকে বলে রাজ্যের প্রধান স্হপতি Mimar Sinan ছিলেন Mihrimah র প্রেমে পাগল। অবশ্য Mimar এর এই প্রেম ছিল একতরফা যা রয়ে যায় না বলা কথা হিসেবেই।

তবে শেষপর্যন্ত এই গোপন ভালোবাসা আর গোপন থাকে নি যখন স্থপতি Mimar পৃথিবীকে উপহার দিলেন তার দুই অসাধারণ স্থাপত্য কর্ম। দুটিই Mihrimah র নাম ধারণ করা মসজিদ যা অবস্হিত ইস্তাম্বুল শহরের দুই প্রান্তে। বহু পৃথিবী বিখ্যাত মসজিদের শহর ইস্তাম্বুলে আসবো আর এই মসজিদগুলো দেখবো না তাতো হতে পারে না। তবে Mihrimah র জন্মদিন ২১শে মার্চ আসলে দেখতে পেতাম সন্ধ্যা বেলায় সূর্য্য ডুবছে Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque এর উপর দিয়ে আর একই সাথে চাঁদ উঠছে Uskudar Mihrimah Sultan Mosque এর পেছন থেকে। একদম তার নামের মতন, Mihrü mah, সূর্য্য এবং চাঁদ একইসঙ্গে, একইসময়। Mimar এর অসাধারণ স্থাপত্য কর্ম আর গাণিতিক ম্যাজিক শুধুমাত্র তার না বলা প্রেমের কথাই বলে। Hats off to you Architect Mimar Sinan ।

২
আধুনিক কম্পিউটার এর সুবিধা যেমন অনেক এর অসুবিধারও কোনো শেষ নেই। এর অন্যতম অসময়ে অপারেটিং সিস্টেমএর আপডেট বিড়ম্বনা। একসময় Microsoft আবিষ্কৃত অপারেটিং সিস্টেম Windows এর যখন তখন আপডেট এর যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে Apple এর মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম iOS ব্যবহার করা শুরু করি। কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। ইস্তাম্বুলে সময় এখন রাট ১ টা। সারাদিনের ঘোরাঘুরির ঘটনাগুলো লেখবার জন্য iPad খুলতেই iOS আপডেটএর নির্দেশনা আর কোন দুঃখে যে তাতে রাজি হয়ে গেলাম তা বলতে পারবো না। এর

খেসারত এখন দিতে হচ্ছে কারণ গত দশ মিনিট ধরে এই মাঝরাতে বসে বসে apple কোম্পানির খণ্ডিত আপেল দেখতে হচ্ছে কিন্তু সিস্টেম আর আপডেট হচ্ছে না।

ইউরোপে এযাত্রায় এটাই আমাদের শেষ রাত। সকাল হলেই মালপত্র নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য প্লেন ধরতে হবে। ছোটবেলায় এরকম লম্বা ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত - আবার সেই পড়াশুনার চাপ, স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম, শিক্ষকের চোখ রাঙানি - যন্ত্রণার কোনো শেষ নেই। আর এখন বয়স হয়েছে বলেই হয়তো লম্বা সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে থাকলেই নিজের চেনা পরিবেশ, চেনা মানুষের জন্য মনটা হাহাকার করতে থাকে। সে হিসেবে আগামী কালতো আমার জন্য একেবারে ঈদের দিন - মন খারাপের ঝাঁপি খুলবারকি কোনো সুযোগ আছে !

তবে এদেশে আসলেই আজকে ছিল ঈদের দিন। ব্যাস্ত শহরটা মোটামুটি একটা অলস দিন কাটিয়েছে। তাইবলে আমাদের মতন পর্যটকদের ঘোরাঘুরির কোনো বিরতি ছিল না। তবে ব্যাতিক্রম একটাই ইস্তাম্বুলের জগৎ বিখ্যাত Grand Bazaar এ কেনাকাটার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় নি। প্রায় ৪০০০ দোকান আর ৬১টি গলিপথ নিয়ে গড়ে ওঠা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এবং বিশাল এই ছাদে ঢাকা বাজারটা ছিল একেবারে বন্ধ। প্রতিদিন যে বাজার আড়াই লক্ষ থেকে চার লক্ষ মানুষের কর্মকান্ডে সরব থাকে সেটি ছিল আজ আশ্চর্য্য রকমের নীরব। Grand bazaar বন্ধ থাকলেও পুরোনো ইস্তাম্বুলের অগণিত গলিপথের আরো হাজারো দোকান কিন্তু ঠিকই খোলা ছিল। এ শহরের রাস্তার খাবারের কোনো তুলনা হয় না। রাস্তায় হাটলেই পাওয়া যায় রকমারি কাবাবের মৌ মৌ গন্ধ আর সেই সাথে শোনা যায় দোকানের কর্মচারীদের ডাকাডাকির আওয়াজ। এশহরে দোকান কর্মচারীদের ডাকাডাকি করে ক্রেতা ধরতে দেখা যায় তা খাবারের দোকান হোক বা কাপড়ের দোকান হোক ব্যাবসার ধরণ মোটামুটি একই। আর এভাবেই আমাদের পরিচয় হয়েছিলো আহমেদ এর সাথে।

আহমেদ বিন মাহফিরুজ - দক্ষিণপূর্ব তুরস্কের Diyarbakır শহর থেকে আসা এক ভাগ্যনাশী তরুণ। তথ্য প্রযুক্তিতে ডিপ্লোমা করেও আহমেদকে ইস্তাম্বুলে এসে কাপড়ের দোকানে কাজ নিতে হয়েছিল। ছেলেটার কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারছিলাম লোক পটিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করবার কৌশলটা ও এখনো ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু বেচারার চাকরির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিলো আমাদের কেনাকাটার ওপর। ছেলেটা খুব সহজ সরল ভাবেই এটা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। ছুটির দিনে দোকান খুলে বসে আছে যদি কিছু রোজগার হয়। দোকান একেবারেই খালি। ছেলেটার জন্য আমাদের বেশ মায়া হলো - যদিও দরকার ছিল না - তারপরও বেশ কয়েকটা টার্কিশ শাল কেনা হয়ে গেলো। এই কেনাকাটার ফাঁকেই আহমেদ বলছিলো বিদেশিদের সাথে কথাবার্তা বলতে ওর খুব ভালো লাগে কেননা এর মাধ্যমে ইরেজীতে কথা বলবার চর্চাটা হয়। ওর খুব ইচ্ছে ইংল্যান্ডে যাবার। তুরস্কে এখন ওর মতন শিক্ষিত তরুনের কাজের সুযোগ খুবই সীমিত। আমাদের দুদিনের ইস্তাম্বুল সফরে যেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি এই আহমেদের মতন যুবকদের - যাদের দল বেঁধে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আর তেমন কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না। EU এবং NATO জোটের সাথে তুরস্কের আগেকার সেই দহরম মহরম আর নেই। তুরস্ক ক্রমশই পশ্চিমা জোট থেকে দূরে সরছে আর ধর্মীয় কট্টরপন্থার দিকে হাটছে। খালিচোখে দেখা দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এর প্রভাবটা ভালোই বোঝা যায়। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের রাজনৈতিক দর্শন Kemalism যা মূলত গড়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষতা আর জাতীয়তাবাদের উপর ভর করে তা আজকের তুরস্কে খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর। অবশ্য সেদিন সন্ধ্যা বেলায় তুরস্কের আরেক রূপ দেখবারও আমাদের সুযোগ হয়েছিল।

Istanbul Bosphorus Dinner Cruise এর টিকেট অনেক ইউরো খরচ করে বেশ আগ্রহের সাথেই কিনেছিলাম। রাতের ইস্তাম্বুল আর সেইসাথে এশহরের ইউরোপিয়ান এবং এশিয়ান উভয় অংশের সব নামকরা স্থাপত্যকর্ম যেগুলো গড়ে উঠেছে সাগর পাড়ে সেগুলো সব একসাথে দেখবার এটা ছিল এক চমৎকার সুযোগ। তবে টার্কিশ সংস্কৃতির নামে জাহাজের খোলা ডেকে যে উদ্দাম নাচ গানের আয়োজন হয়েছিল তা আমাদের একেবারেই ভালো লাগে নি। এক বৃদ্ধ লোকের বল্গাহীন নাচানাচি দেখে মনে হচ্ছিলো শুকনো আঙুরের সূরা যা Shiraz Wine নামে জগৎবিখ্যাত তা এখনকার তুরস্কেও কম প্রভাব ফেলে নি।

ঘড়ির কাটা এখন রাত তিনটের দাগ ছাড়িয়ে আরো বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছে। হোটেলের সামনের রাস্তা একেবারে চুপ। চোখের পাতায় এখনো ঘুম আঘাত করে নি। আর কিছুক্ষন পরেই সকাল থেকে শুরু হবে এক ক্লান্তিকর ১৬ ঘন্টার আকাশ যাত্রা। তাই ঘুমটা এখন খুব জরুরী। তবে তার চেয়েও জরুরী ভুলে যাবার আগেই ইউরোপের ডাইরির লেখাটা শেষ করা। সময় শেষ হয়ে আসছে। ইউরোপে আবার কবে আসা হয় কে জানে ! এখানে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। দেশ, সমাজ, মানুষ সব দ্রুতই বদলে যাচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতা ভাবনার শিখাকে উস্কে দেয়। বেশ দূর থেকে একটা বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে। কোনো একজন গুণী বাঁশিওয়ালা মনপ্রাণ দিয়ে সুরের মূর্ছনা ছড়াচ্ছেন। মনের মাঝে দুঃখের বাষ্প একটু একটু করে জমে উঠছে। কেন জানি ফকির লালন শাহের একটা গান খুব গাইতে ইচ্ছে করছে ..... তুমি দিন থাকতে দ্বীনের সাধন কেন করলে না সময় গেলে সাধন হবে না ..... সময় গেলে সাধন হবে না জানো না মন খালে বিলে থাকে না মিল জল শুকালে ..... জানো না মন খালে বিলে থাকে না মিল জল শুকালে কি হবে আর বাঁধা দিলে শুকনা মোহনা ..... সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না .....

Chicken - Mushroom
Recipe

Ingredients:

Chicken	800gms
mushroom	100gms
oil	1 tablespoon
butter	1 tablespoon
onion	1 large
garlic	1 tablespoon
capsicum	1 no
tomato	2 no
tomato puree	1/2 cup
kali mirch	1/2 teaspoon
maida	2 tablespoon
salt	to taste
sugar	1/2 teaspoon

Method:

Finely chop tomato, capsicum, onion and garlic. Clean and wash the chicken and mushroom.
Sprinkle the maida and a little salt on the chicken and mushroom pieces. Mix well.
Heat butter and lightly fry the chicken and mushroom pieces. Remove the chicken and mushroom pieces.
Add oil to the remaining butter.
Add garlic and then onion to the oil. Stir. Cover and cook for 2 mins.
Add tomato, stir, cover and cook for 5 mins.
Add the chicken, mushroom, stir and cook covered till chicken are nearly done.
Add the rest of the ingredients. Add the salt to taste. Bring to boil.
Cover and let simmer for 5 mins.
Remove from heat and serve with steamed rice.

This is one of my favourite recipes. To get the correct taste, please follow instructions correctly for the first time, before making any experiments with this recipe. Please try and let me know how you like it.

Sudeshna Chatterjee

Artist: ***Raunak Giri (15 years)***

Some People Draw

Some people draw or sing
Paint the world with colours of everything
Some people play sport, climb mountains,
Break records and I
I dream the world in Technicolour
Like that's a thing
If you saw the inside of my imagination, you might think
That I am stuck in a pre-teen's vivid dream
And it is beautiful
But when I try to share it
Some of the details chip off, and exposes the bare layer
Underneath, makes it look unsavoury
All that my dreams are ever made of
Are nightmares
Wrapped up in blanket upon blanket of
Rainbows and fairy dust and hot pink cascades of life
All that my dreams are made of are monsters.
And you are in it.

© Sananda Chatterjee

In the Margins

Gather 'round
In our palace of dust
Where all your exotic dreams
Are a must see, must do, pay-per-view
It is small
A bit tight, cut out to measure
To the box we have been living in
Fit in to our shoes
It is a rare opportunity
Don't be shy
Follow us in
Just remember
There will be no wifi
No sparkling water
No orphans to save
No worlds numbered 1, 2, 3, 4
No walls dividing me and you
No turmeric lattes
No Coconut Oil to cure death
No news that's good news
No truths
No lies
No diversity on the agenda for the sake of it
No Others
Be prepared for your mind to implode
Call your uncles, aunties and children
All are welcome,
Young or old
To the margins of the pages
We have always called home

© Sananda Chatterjee

রেলপ্রেমিক সত্যজিৎ -

ভাস্কর বসু

বিনয় মুখোপাধ্যায় যাযাবর ছদ্মনাম নিয়ে লিখেছিলেন একটি অনু উপন্যাস, 'দৃষ্টিপাত'। তার একটি অনুচ্ছেদ প্রায় প্রবাদপ্রবচন হয়ে গেছে,

"আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ!"

এই যতির আয়েশ বলতে ট্রেনযাত্রার কথাই বলা হয়েছে, বেগবান যান টি অবশ্যই বিমান। আমাদের ভারতীয় প্রযুক্তিতে রেল অবশ্যই বড় ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি ভারতীয় চলচ্চিত্রেও রেলযাত্রার বড় ভূমিকা দেখে থাকি আমরা। যে চলচ্চিত্র কে আমরা আধুনিক চলচ্চিত্রের জনক বলে থাকি, সেই 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে কিন্তু এক অপূর্ব ভূমিকা ছিল ট্রেনের।

অপু ও দুর্গা - দুজনে মিলে দৌড়তে দৌড়তে ট্রেন দেখতে যাচ্ছে। উপন্যাসেও ছিল সে ঘটনা। আর এত অপূর্ব সেই চলচ্চিত্রায়ন, যা আজো আমাদের মনকে দোলা দিয়ে চলেছে।

নীল আকাশ, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্রেন। ষ্টীম ইঞ্জিনের ধোঁয়া পাক খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। দুটি গ্রাম্য বালক বালিকা পূর্ণ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। তারা যেন পৃথিবীর সব ছেলে মেয়েদের প্রতিনিধি। আরো আশ্চর্য, তাদের এই অকপট বিস্ময়ের অনবদ্য চিত্রটিও খোদ স্রষ্টার ও মাথায় ঢুকে গেল।

পথের পাঁচালীর সেই বিখ্যাত দৃশ্য 1

আসলে সত্যজিতের নিজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন শিশু। তাঁর অদম্য কৌতূহল, অফুরন্ত প্রাণশক্তি। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো বলেই ছিলেন, তাঁর মতে সত্যজিৎ সম্পর্কে যথোপযুক্ত বিশেষণ হল – 'শহুরে অপু'। কোন শিশু অভিনেতাকে যখন নির্দেশ দিতেন, তাঁর সেই চারিত্রিক গুণটি সহজেই প্রতিভাত হত। আর ট্রেন তো সব শিশুরই প্রিয়।

শিশু অভিনেতাকে নির্দেশ 1

পরশুরামের ‘বিরিঞ্চিবাবা’ গল্পে কিন্তু ট্রেনের সেরকম কোন ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু সত্যজিৎ ‘মহাপুরুষ’ চলচ্চিত্রে বাবার আগমন ঘোষণা করলেন ট্রেনেই। সেই ট্রেনেই দেখা গেল, সকালবেলা বিরিঞ্চিবাবা সূর্যকে জাগিয়ে দিচ্ছেন, “ওঠ, ওঠ” বলে!! সেই দেখেই ভক্তরা বুঝে গেলেন, ‘মহাপুরুষ’!

মহাপুরুষের আবির্ভাব 1

পরবর্তী কালে সত্যজিতের সৃষ্টিতে ট্রেনের এক বড় ভূমিকা দেখা যায়। চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য, দুটিতেই। তিনি এবং তাঁর চরিত্ররা খুবই উপভোগ করতেন এই ট্রেন যাত্রা। এমনকি বাংলার ম্যাটিনি আইডল খোদ উত্তমকুমারকে অবধি ট্রেনে চড়িয়ে এক অনন্য চিত্রকাব্য উপহার দিয়েছিলেন -"নায়ক"!!

"নায়ক" পুরস্কার নিতে দিল্লী যাচ্ছে। প্লেনে নয়, ট্রেনে। এখানে তিনি দেখালেন "যতির আয়েশে" লব্ধ এক নতুন আখ্যান। এই ট্রেনযাত্রার সঙ্গে কেমনভাবে মিলে গেল নায়ক অরিন্দমের জীবনের যাত্রাপথও। সদ্যপরিচিতা অদিতির কাছে সে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হল, যতির আয়েশেই। বিমানে দিল্লী যেতে লাগে মাত্র ঘন্টা দেড়েক, তাতে সম্ভব ছিলনা।

এছাড়া ট্রেনে সহযাত্রীরাও বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর। তাদের জীবনে সাফল্যের মাপকাঠি একেবারেই আলাদা। তাদের সম্পর্কে এসে যেন নায়কের জীবনের যাত্রাপথের ঘটনা অরিন্দমের মনে দোলা দেয়। আমার মনে হয়েছে, এখানে 'নায়ক' জীবনের দৌড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেন ট্রেনে একটু শান্তি পাচ্ছে, এমন ভাবনাও থাকতে পারে।

দীর্ঘ ট্রেনযাত্রাতে নিজেকে উন্মোচন 1

ট্রেনের নাতিদীর্ঘ সময়টিতে নায়ক অরিন্দম এবং তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এটি কিন্তু বিমানযাত্রাতে আদৌ সম্ভব নয়। এক সাংবাদিকের কাছে তিনি যেভাবে উন্মুক্ত হতে পারলেন, তার পিছনে ঐ যাত্রার দৈর্ঘ্য এবং পরিবেশ খুব সহায় ছিল। তাঁর জীবনের শুরুর দিন থেকে নিজের স্বপ্নের কথা, অপমানের কথা, দ্বিধা-দ্বন্দের কথা, দোষের কথা অকপটে তিনি স্বীকার করতে পারলেন এক সদ্য পরিচিতার কাছে। নিজের মনে তিনি হয়তো চেয়েছিলেন এই যতির আয়েশ, নিজের বেগবান জীবনে কি তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে যাননি? নাহলে বন্ধুর কাছে কেন বলবেন, *'২৪টি ঘন্টা এসব ঝামেলার থেকে স্রেফ রেহাই চাই। প্লেনের বুকিং পাওয়া যায়নি, এক হিসেবে ভালই হয়েছে।'*

তাঁর কিশোর সাহিত্যে তো ট্রেনের বিরাট ভূমিকা। বাক্স রহস্য গল্পে ট্রেনেই বাক্স বদল হয়ে গল্পের শুরু। একই রকম দেখতে দুটি বাক্স, অদল বদল হয়ে কি গণ্ডগোল হল। তাঁর প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ মহাশয়ের একটি গল্পের নাম বাক্সবদল। সেখানেও ট্রেনেই বাক্সবদল হয়। এই কাহিনী অবলম্বনে একটি কাহিনীচিত্র হয়, তার চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত সত্যজিৎ করলেও পরিচালক তাঁর সহকারী নিত্যানন্দ দত্ত। সম্ভবত "বাক্সরহস্য" র অনুপ্রেরণা এটিই।

"বাদশাহি আংটি" গল্পেও দেখেছি লখনৌ স্টেশন বারবার এসেছে। ডুন এক্সপ্রেসে চেপে সবাই মিলে হরিদ্বার যাচ্ছে। সেখানেও ট্রেনে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। অস্টিওপ্যাথ শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর সঙ্গে আলোচনাতে রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে। *'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলীর দিকে। কামরায় সবশুদ্ধ সাতজন লোক।'* এত সহজে ট্রেনের একটা সজীব ছবি! তারপর ট্রেনের দোলানিতেও তোপসের ঘুম আসছে কিন্তু চিন্তা এত ঝাঁকুনির মধ্যে ঘুম আসে কিকরে? তোপসেকে ট্রেনপ্রেমী ফেলুদা বোঝাচ্ছে, *"এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয় মানুষের কান অভ্যস্ত হয়ে যায়; তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করেনা। আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে। খোকাদের দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিসনি।"!!*

মনে করা যাক, "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্পটি। সেখানেও ট্রীটমেন্ট পুরো 'নায়ক' ধর্মী। নামী ম্যাজিশিয়ান তাঁর প্রাক্তন গুরুর কাছ থেকে একটি দৈব ম্যাজিক লাভ করেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাতে তিনি একলাই ঘুমিয়ে পড়েন, স্বপ্ন দেখেন। "ভূতের রাজা দিল বর"!! একখানি ম্যাজিক, কিন্তু মোক্ষম লাভ।

‘বারীন ভৌমিকের ব্যারাম’ গল্পটিতেও বারীন ভৌমিক তাঁরি মতন আরেক ক্লেপ্টোম্যানিয়াকের সন্ধান পান ট্রেনের কামরাতে। ‘অনাথবাবুর ভয়’ গল্পে অনাথবাবুর সঙ্গে লেখকের আলাপ ট্রেনের কামরায়। সেখানেও ট্রেনের অনেক যাত্রীর মধ্যে তাঁর বেঞ্চে পাশে বসে থাকা মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়। ‘রতনবাবু আর সেই লোকটা’ গল্পেও রেল ব্রিজের এক মুখ্য ভূমিকা।

১৯৭১ সালে ‘দেশ’ পত্রিকাতে প্রথম ফেলুদা কাহিনী প্রকাশিত হয় – ‘সোনার কেল্লা’। সেই গল্পে ট্রেনের ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালে সেই কাহিনীর ভিত্তিতে যে চলচ্চিত্র তৈরী করেন সত্যজিৎ তাতে ট্রেন প্রায় একটি চরিত্রই হয়ে ওঠে।

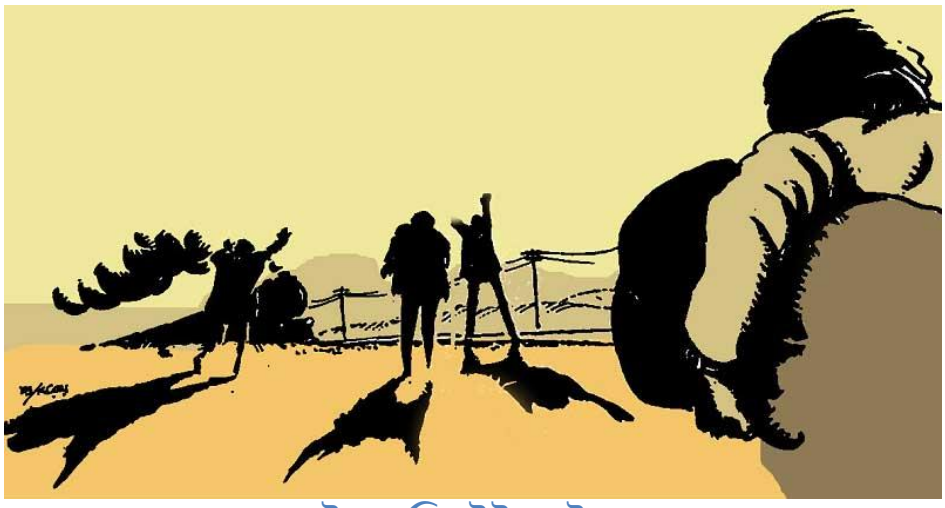

বইতে ছবি - উট ও ট্রেন 1

আমাদের সকলের মনে আছে এই সিনেমাতে ট্রেনের কি অসাধারণ ভূমিকা। প্রথম থেকেই ভাবা যাক। যে ট্রেনে করে ডঃ হাজরা মুকুলকে নিয়ে রওয়ানা দেন রাজস্থানে, ঘটনাচক্রে সেই একই ট্রেনে যাত্রা করেন মিঃ বর্মন ওরফে ভবানন্দ ও তাঁর চ্যালা মন্দার বোস। ট্রেনের কামরাতেই আলাপ করে ম্যাজিক দেখিয়ে মুকুলকে তাক লাগান মন্দার বোস। ক্রমশ সেই আলাপ ঘনীভূত হয়।

ফেলুদা ও তোপসেও আবার তুফান মেলে রওয়ানা দেয়। তাদের ট্রেনে ‘যতির আয়েশ’ একটু বেশী মাত্রায়, কারণ কানপুর স্টেশনে ফেলুদা তোপসেকে সন্দেশ খাওয়ার পরামর্শ দেয়, ‘ট্রেন লেট চলছে, দিল্লী পৌঁছতে দেরী আছে’’। লালমোহনবাবুর আবির্ভাব ট্রেনেই, কুলির সঙ্গে তর্ক করতে করতে। তারপর সেই উটের পিঠে চড়ে ট্রেন ধরার অসামান্য প্রয়াস। রামদেওরা থেকে জয়সলমীর যাওয়ার পথে ট্রেনের মধ্যে ফেলুদা, জটায়ু, মন্দার বোস আর ডক্টর হাজরার সাংঘাতিক সব কীর্তিকলাপ।

সেই বিখ্যাত 'সাধের দৃশ্য' 1

এই ট্রেনদৃশ্য তুলতে গিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে সত্যজিৎ কে। *"মরুপ্রান্তরের বিশাল ঝলমলে আকাশ ট্রেনের মিশকালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে – এ না হলে জমবে কি করে?"* তিনি নিজেই লিখেছেন 'একেই বলে স্যুটিং' বইটিতে। স্যুটিং হচ্ছিল "সোনার কেল্লা" ছবির। মাঝে প্রায় বানচাল হতে যাচ্ছিল, তিনি স্মৃতিকথাতে প্রায় আর্তনাদের সুরেই লিখে ফেলেছেন, *"ফেলুর দল উটের পিঠে করে ছুটে গিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছে, আমার এই সাধের দৃশ্য কি ছবিতে স্থান পাবে না? না এ হতেই পারে না!"*

রাত্রে আবার রামদেওরা থেকে ট্রেন ধরার দৃশ্য, যেখানে ফেলুদা মন্দার বোসকে চিনতে পারবে তার আংটি দেখে। তারপর রাতে ট্রেনের কামরাতে মারামারি। প্রাণে বেঁচে মন্দার বোস যে কামরাতে যান, সেখানেই ছিলেন আসল ডঃ হাজরা। পরদিন সকালে আবার ট্রেনের কামরা থেকেই তোপসেকে দেখায় ফেলুদা – *"তোপসে দেখ, সোনার কেল্লা!"*

ট্রেনের জানলা থেকে সোনার কেল্লা[1]

"আমার এই সাধের দৃশ্য" - ব্যস। এখানেই 'আকাশের পাখি' ধরা দিয়েছেন তাঁর ভক্তকুলের কাছে। 'সোনার কেল্লা'র সন্ধানে জয়সলমীর ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ পর্যটক। *'জাতিস্মর আছে কি নেই, তা জানা নেই' 'ভবানন্দ মিথ্যেই পরিশ্রম করলেন'* সবই হয়তো সত্যি। কিন্তু মিটার গেজের ট্রেনে করে আজো পর্যটকরা চলেছে জয়সলমীরে 'সোনার কেল্লা'র সন্ধানে, ট্রেনের জানলা থেকে তারা অপলকে তাকিয়ে আছে বিশাল মরুপ্রান্তরের দিকে – এর চেয়ে বড় সত্য আর কি হতে পারে? তাঁর মনোভূমিতে রচিত সত্যজিতের সত্যই আসল – কারণ শিল্পমাধ্যমে *"ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি. রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"*

তথ্যঋণ –

1. একেই বলে শুটিং – সত্যজিৎ রায় - আনন্দ
2. https://www.dailyo.in/arts/satyajit-ray-sonar-kella-myths-cinema-train-journeys/story/1/17290.html
3. **ফেলুদা সমগ্র ১ -২ - আনন্দ**

Wishing you & your Family a Happy Durga Puja

Proudly Supported by

THE LION FOUNDATION

বনেদী বাড়ি আর দুর্গাপূজা এই দুটো শব্দ যখন একসাথে উচ্চারিত হয় তখন তা বাঙালির কাছে এক অন্য মাত্র এনে দেয়।দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান আর তা যখন কোনো বনেদী বাড়িতে উদযাপিত হয় সেটা নির্দিধায় এক উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্তমান বাংলায় থিমের পুজোর ভিড়ে যে কোটি বনেদী বাড়িতে মা দূর্গা আসেন তাদের কদর, সাবেকি রীতি আচার অনুষ্ঠানের কাছে থিমের পুজোকে কোনো ভাবেই মেলানো যাবে না।

দূর্গা পুজো মানে আমাদের চোখে ভাসে শরতের রৌদ্রজ্জল আকাশ, কাশ ফুলের বন, শিউলি ফুলের সুবাস, ঠাকুর বাড়ির দালান, সাদা কালো মার্বেলের উঠোন, হই চৈ, খাওয়া দাওয়া, ঢাক কাসরের আওয়াজ অন্য অর্থে বনেদী বাড়ির পুজো।

আগেকার দিনে জমিদার দের পুজো পরবর্তিকালে বনেদী বাড়ির তালিকা যদি আমরা পেশ করতে চাই তাহলে এই ছোট্ট নিবন্ধে তা সম্ভব নয়, কিছু বিখ্যাত বনেদী পুজোর সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হই।

শোভাবাজার রাজবাড়ি

কলকাতার বনেদী পুজোর কথা বলতে গেলে নীঃসন্দেহে সর্বপ্রথম শোভাবাজার রাজবাড়ির কথাই আসে।১৭৫৭ সালে নবকৃষ্ণ দেব এই পুজো শুরু করেন।তত্কালীন বড়লাট লর্ড ক্লাইভের সৌজন্নে এই পুজোর আরম্ভ হয় এবং সেইজন্য পরবর্তিকালে এই পুজো কে কোম্পনীর পুজো নামেও

অভিহিত করা হতো। পুরনো প্রথা মেনে আজ ও রাজবাড়িতে হয় ডাকের সাজের মূর্তি, আর রথ যাত্রার দিন হয়ে যায় কাঠামো পুজো। কথিত আছে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব'র আমলে প্রতিমার গায়ে সোনার মুকুট, নথ,

মানতাসা, হার প্রভিতি নানা গয়না শোভা পেত। দেব পরিবার ব্রাহ্মণ নয় বলে মায়ের ভোগ দিতে পারেন না, সেই জন্য তারা "মিঠাই ভোগ" দেন। বিশাল পেতলের থালায় ৩.৫ ফুট ব্যাপী মিঠাই বানান রাজ পরিবারের অধীনে থাকা উত্কল বাসী (উড়িষ্যা বাসী) মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারকের। এই পুজোর আরম্ভর-সাজ সজ্জা অনেক বেশি ছিল, কবি গান, বাইজী নাচ, পায়রার লড়াই ছিল এই পুজোর বৈশিষ্ঠ। প্রবাদ আছে পুজোর সময় মা আসেন দাঁ বাড়িতে গয়না পরতে, মিত্র বাড়িতে ভোগ খেতে আর সন্ধেয় শোভা বাজার রাজ বাড়িতে গান শুনতে। প্রথা মেনে আজও নবমীর দিন ৯ টি সিঙ্গি মাছের বলি দেয়া হয়। এই রাজবাড়ির সন্ধিপুজো খুব বিখ্যাত, দূর দুরান্ত থেকে লোকজন আসে সন্ধিপুজো দেখতে।

দর্জিপাড়ার মিত্রবাড়ি

১৮০৭ সালে তত্কালীন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রাধা কৃষ্ণ মিত্র দর্জিপাড়ার নিজ বসত বাড়িতে এই পূজারাম্ভ করেন। নীলমনি মিত্র স্ট্রিট এ অবস্থিত মিত্র পরিবার বিগত ২০০ বছর ধরে রীতি নীতি মেনে এই পুজো করে আসছেন। মিত্র বাড়ির মায়ের প্রতিমার বৈশিষ্ঠ হলো তিন চলার মূর্তি, আর ঘোড়া সিংহের আদলে মহিষাসুর বধ করেন। এই বাড়ির মায়ের ভোগ খুব বিখ্যাত, কথিত আছে মা আসেন এই বাড়িতে ভোগ খেতে, সেই ধারা মেনে আত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পুজোর কদিন মায়ের

ভোগ দেয়া হয়। মিত্র বাড়ির পুজোর চিরাচরিত প্রথা মেনে পালন করলেও দশমীর দিন নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর রীতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কারণ খাঁচায় পাখি আটকে রাখা অপরাধ. এই বাড়ির মহিলাদের সিঁদুর খেলা আজ বিখ্যাত।

জোড়া সাকোর দাঁ বাড়ি

কলকাতার তত্কালীন বনেদী বাড়ির পুজো ছিল কে কত বড়, কত প্রভাবশালী, কার কত আধিপত্য তার প্রমান দেয়া। সেই নিরিখে বিচার করতে গেলে জোড়াসাকোর দাঁ বাড়ি কোনো অংশে কারো থেকে কম যায় না। গোকুল চন্দ্র দাঁ সাত গাঁ ছিয়ার বেহুলা নদীর তীরে তার জমিদারী স্তাপন করেন। যশ, খ্যাতি, আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ার পর তিনি কলকাতার জোড়া এলাকায় বসতি গড়েন। নিজের কোনো সন্তান বা উত্তরসুরী না থাকাই, এক আঁত্মীয় ছেলে শিবকৃষ্ণ কে দত্তক নেন ১৮৪০ সালে এবং সেই থেকে অতন্ত্য নিষ্ঠা এবং আরম্বরের সাথে দূর্গা পূজা শুরু করেন। বিগত ১৭১ বছর ধরে

উত্তিসুরীরা চিরন্তন প্রথা- রীতি নীতি মেনে আজ সেই পূজা উদযাপন করেছেন। সুন্দরবন থেকে আনা গরান কাঠ দিয়ে মাতৃ মূর্তি তৈরী হয়। জন্মাষ্ঠামির দিন মায়ের দেহের সাথে মাথা মিলিত করা হয়। মূর্তির উচ্চতা ১২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হয়। মাতৃ মূর্তি হয় হলুদ রঙের, অসুর কালো রঙের, সরস্বতী হয় দুধ সাদা এবং লক্ষ্মী মূর্তি হয় হালকা সবুজ রঙের। শোনা যায় যে শিব কৃষ্ণা দাঁ জার্মানি থেকে হীরা এবং প্যারিস থেকে পান্না আনান মায়ের গয়না সুসজ্জিত করবার জন্য। সেই জন্য বোধ হয় মা কলকাতায় দাঁ বাড়িতে যেতেন গয়না পড়তে। ওপার বাংলার শিল্পীরা আসতেন

মায়ের মূর্তি আর মন্ডপ সাজাতে। পুরনো ধারা অটুট রেখে প্রতিপদে মায়ের বোধন হয়, পরিবারের গৃহ বধূরা মা কে বরণ করে নেন, তীর কাঠি দিয়ে মা কে সুরক্ষিত করে রাখা হয়। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা নয় রকম জল দিয়ে চান করানো হয়, সেগুলো হলো সাত সমুদ্রের জল, নারকেলের জল, বৃষ্টির জল, পঞ্চরত্ন মিস্ত্রিত জল, পদ্মরেনু, সরস্বতীর জল, ঝর্নার জল, সর্ব তীর্থের জল এবং শুদ্ধ জল। তার পর নাবপাত্রিকা স্থাপন হয়। নিয়ম অনুযায়ী ভোগারতি, সন্ধ্যারতি প্রদান করা হয়। সন্ধিপুজোর ভোগ কুলের গুরুদেব কে উত্সর্গ করা হয়। নবমীর দিন হয় কুমারী পূজা।প রিবারের যেই ব্যাক্তি সংকল্প করেন তিনি প্রথা অনুযায়ী "ধুনুচি প্রদান" পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করে।

সবর্ণ রায় চৌধুরী'র পুজো

সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাংলার একটি ঐতিহাসিক জমিদার পরিবার। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এই পরিবার ছিল কলকাতার জমিদার। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির সত্ব সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে ইজারা নেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কথিত আছে ১৬১০ সালে বরিশালের লক্ষ্মী কান্ত চৌধুরীর স্ত্রী সাপরিবারে এই পুজো শুরু করেন, সেই থেকে অদ্যাবধি বড়িশার পারিবারিক বাড়িতে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এটি বাংলার প্রাচীনতম দুর্গোৎসবগুলির মধ্যে একটি এবং সম্ভবত কলকাতা অঞ্চলের প্রথম দুর্গাপূজা। বর্তমানে সাবর্ণ পরিবারে মোট সাতটি দুর্গাপূজা হয়। এগুলির মধ্যে ছয়টি হয় বড়িশায় এবং সপ্তমটি হয় বিরাটিতে। মোট ৭টি পুজো প্রচলন হলেও আজ ও তাদের ঐতিয্য অটুট রয়ে গেছে। সব বাড়িতেই মা কে জাঁকজমক পূর্ণ ভাবেই সাজানো হলেও বিরাটিতে নিমতার বাড়িতেই মা কে বেশী গয়না দিয়ে সাজানো হয়। বড়িশার পূজাগুলি হল আটচালা, বড়োবাড়ি, মেজোবাড়ি, বেনাকি বাড়ি, কালীকিংকর ভবন ও মাঝের বাড়ি। দুর্গাপূজা ছাড়াও সাবর্ণ পরিবারে চণ্ডীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, দোলযাত্রা ও রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত।

ভবানীপুরের মল্লিক বাড়ির পুজো

১৮৬০ সালে রাধাগোবিন্দ মল্লিক বর্ধমানের শ্রীখন্ড থেকে এসে ভবানীপুরের মল্লিক বাড়ির স্থাপন করেন. ১৯২৫ সাল থেকে গ্রামের বাড়ির থেকে দূর্গা পুজো ভবানীপুরের বাড়িতে স্থানান তড়িত করা হয়। দুর্গাপূজা থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত উত্সব পালিত হয় এই বাড়িতে।দূর্গা পূজা থেকে লক্ষ্মী পুজো অব্দি বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলতে থাকে।পূর্বে যাত্রা পালা, নাম সংকীর্তন ইত্যাদি হতো যা বর্তমানে নাটক আর রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অনান্য সঙ্গীত'এ রুপান্তরিত হয়েছে।পরিবারের পুরুষেরা যাত্রা-নাটকের দিক তা দেখেন আর মহিলারা পূজার উপাচার অনুষ্ঠান তা দেখেন।একান্ন বর্তী পরিবারের প্রায় দুই - তিন শো লোক সামিল হতেন পুজোতে।পুজোর রীতি নীতি দুই দালান অন্নপূর্ণার দালান এবং দূর্গা দালান এ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের লোকজন ভারতের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সত্বেও পুজোর কদিন আড্ডা এবং পারিবারিক ভোজ এ সামিল হয়ে যান। বিজয়া দশমীর দিন পরিবারের সর্ব জেষ্ঠা গৃহিনী মা কে প্রথম বরণ করেন তারপর একে একে অনান্যরা।২৪ বাহকের কাঁধে চেপে মা কে বলরাম বোস ঘাটের আদি গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হয়। রীতি অনুযায়ী পরিবারের সর্ব জেষ্ঠ গৃহ কর্তা অষ্ট দুর্বা বা আট রকম দূর্বা দিয়ে সবাই কে আশির্বাদ করেন এবং সিদ্ধি পরিবেশন করেন।তারপর চলে রাত ভোর গান বাজনার আসর।

আধুনিক থিমের পুজো যতই লোক টানুক, ভিড় বারাক, সাবেকি পুজো বলতে আমরা আজ বুঝি এক চলার ঠাকুর, পাত পেরে খাওয়া, নিয়ম নিষ্ঠা মেনে পুজো পালন আর তার ধারা আজ বজায় রেখেছে বনেদি বাড়ির পুজোগুলো.

তাপস কুমার মণ্ডল

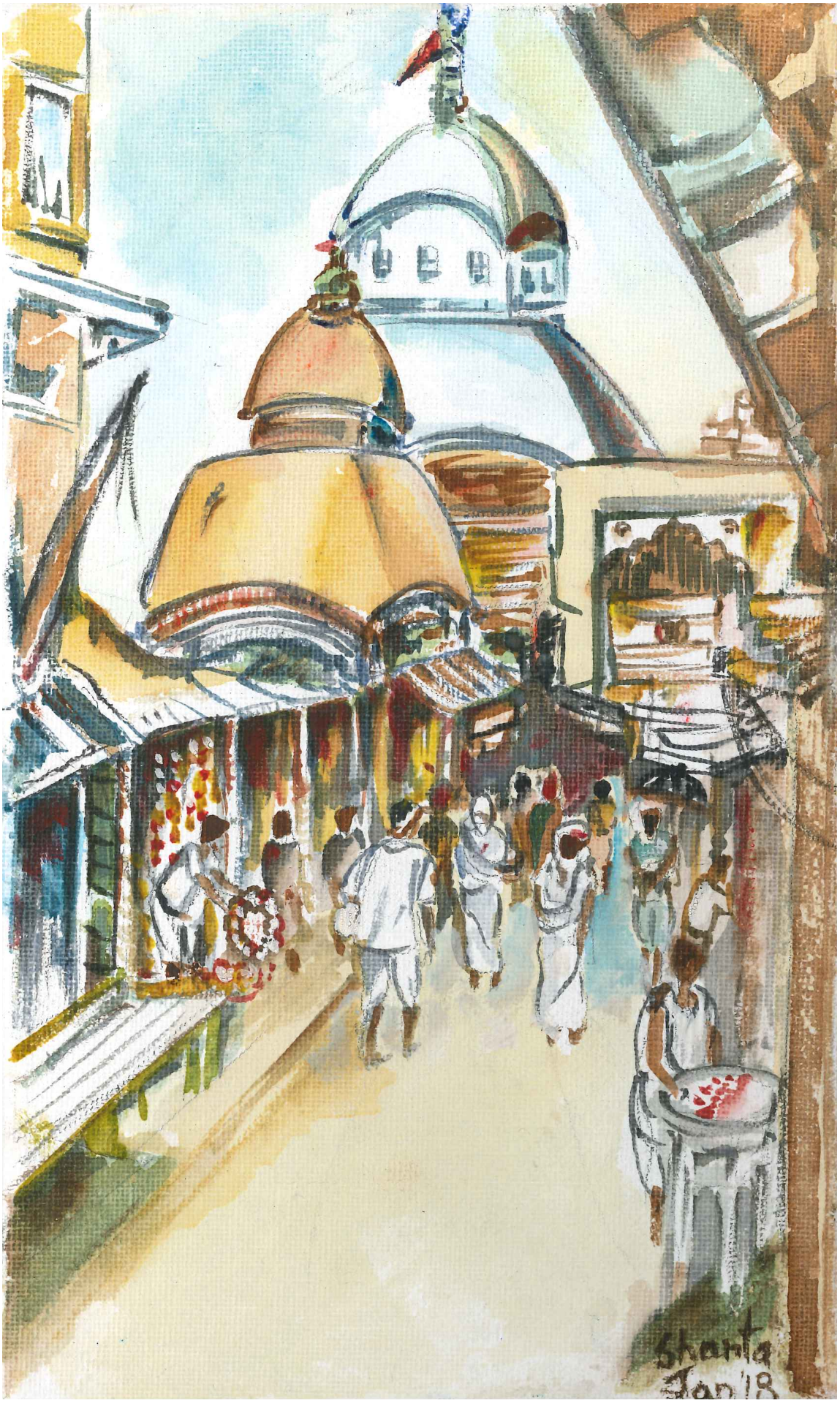

Artist: ***Shanta Basu***

This Happened...

This happened at least twenty years ago, maybe earlier. Abira and I were heading to Jamshedpur, in the first flush of marriage, aquiver with excitement at the prospect of watching a high quality live performance of ghazals. My uncle and a host of my cousins lived in Jamshedpur, the steel city, still a beacon of hope back then in the industrial desert that was the state of Bihar. The concert featured Hariharan, a vocalist of exceptional ability; and to add spice to the mix, Bula, a budding singer (who also happens to be a distant relation) was going to accompany the great “Hari” on a couple of songs.

The event was part of the annual cultural fest of XLRI, a management institute nestled in a leafy campus and peopled by nerdy young folk wearing serious expressions. At the appointed time, we and the cousins bundled out of the car, which was threatening to burst at the seams due to the weight of humanity packed inside. After duly checking that our finery and make up were all in place, we walked into the auditorium, trying our best to look like cognoscenti of the fine arts.

The concert more than lived up to our expectations, and with our hearts filled to the brim, we came back home, floating in what seemed like an ocean of melody. Everyone agreed that Hari was the best thing to have happened to ghazal in decades. Bula’s efforts to match the master note for note were also highly commended, and there was unanimity that here was a star in the making.

As the day after dawned, we packed with heavy hearts. I dreaded the return to the daily drudgery of professional life, and my wife was already fretting over the mountain of housework that awaited her — this was in the days of single-income households, where conjugal roles were split in very traditional lines. We waved tearfully to the whanau on the train station, and with a rock and a jolt, we were off steaming back to Kolkata on the Steel Express.

Till today, I struggle to explain to myself the sequence of events that unfolded soon afterwards; it’s possibly a bit extreme to say that I took leave of my senses. I remember getting off my seat, promising to Abira that I would be back in a few minutes. Perhaps I intended to check out the food available in the pantry car, I really can’t remember now. What I do remember with perfect clarity is the presence of Hariharan in a red tee shirt, slouched next to a window, turning his head to look at me companionably as I was walking past. There was never a greater opportunist than me, as I held out the back of my train ticket for him to scribble his autograph. After the usual fan-blabber, I felt it was time to show off my encyclopaedic knowledge to him; stamp my mark on his memory, so to speak. ‘I really loved the way you sang “Seene mein jalan” in the movie Gaman. And on debut too!’ I gushed,’ One of my favourite ghazals!’ To which Hari replied, an angelic smile lighting up his face,’ That song was sung by Suresh bhai (Suresh Wadkar). Not by me. I sang “Ajeeb saaneha mujh par”.’

I made a hasty exit, after mumbling ‘Yes of course, that’s the song I meant’. There was a burning sensation at the back of my neck, and I thought I could hear faint sounds of laughter from around me, but when I looked around all I could see was an old couple seated at the far end of the compartment, engrossed in their home-made samosas.

Abira later commented that I looked unwell when I came back to join her, and I responded by saying it might be the after-effects of the prawn curry I had the night before. But I could never really explain to her why I remained unusually quiet over the duration of the trip home.

- Krittibas Dasgupta

Durga Pujo

Pujo is a moment full of glee,
It's essence makes us feel free.
The noise of the dhak fills the air with joy,
We dance to the beat and enjoy.
Durga Maa's blessings treat us with care,
So we do the prayers and treat everyone fair;
The food gets prepared with faith,
And it obviously tastes great.
We eagerly wait for Durga Maa every year,
To celebrate happily without any fear.

Written by: Emili Biswas

শরৎচন্দ্র

অমিত সেনগুপ্ত
(অকল্যান্ড)

শরৎচন্দ্রের জীবন বড় বৈচিত্রময়। প্রথম জীবনে তাঁর অনেকটা সময় কেটেছে ছন্নছাড়া হিসাবে। অনাহারে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। তিনি নিজেই বলেছেন 'এমন দিন গেছে যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়েছি। এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে - তারা ভদ্রলোক। কত হাড়ী-বাগদির বাড়িতে আহার করেছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লী-সমাজ।'

শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে, সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চাকরির জন্য বর্মায় গিয়ে, সেখানেও গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন। একাধিক নারীর প্রণয় প্রার্থী হয়ে ব্যার্থ হয়েছেন। 'নারীর ইতিহাস' লিখতে গিয়ে অনেক পতিতালয়ে গিয়েছেন এবং তার জন্য তিনি প্রচুর দুর্নাম কুড়িয়েছেন। তিনি 'সমাজচ্যুত' হয়েছেন, 'একঘরে' হয়েছেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেশের কাজে মেতেছেন। আবার কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামী হয়েও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন এবং তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। যা লিখেছেন তার জন্য প্রচুর গালাগালি ও প্রশংসা দুইই কুড়িয়েছেন। দেশের একদল লোক তাঁকে মাথায় তুলে নিয়েছেন, আবার একদল তাঁকে অপাঙক্তেয় করেছেন।

তিনি ছিলেন খেয়ালি, আত্মভোলা, মজলিশি, অতিথিপরায়ন, বন্ধুবৎসল ও মানব দরদী। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারাণী পদক উপহার দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবার বি-এ ক্লাসের পেপারসেটার বা প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত করেছিল। এ সব ছাড়াও দেশবাসী তাঁকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' 'কথা সাহিত্যিক' ইত্যাদি নামে বিভূষিত করেন।

তিনি কেবল সাহিত্যিক, গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও চিকিৎসকই ছিলেন না, তাঁর চরিত্রে আরও অনেক গুণ ছিল। তিনি সাপুড়েদের মত অনায়াসেই বিষধর সাপও ধরতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্টটি সবার আগে চোখে পড়ে, তা হল - মনে প্রাণে তিনি ছিলেন দরদী মানুষ। মানুষের, এমনকি জীবজন্তুর দুঃখ-দুর্দশা দেখলে বা তাদের দুঃখের কাহিনী শুনলেও তিনি অত্যান্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় এজন্যে তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ত। জীবজন্তুর প্রতি স্নেহবশত তিনি বহু বছর সি-এস-পি-সি-এ অর্থাৎ কলকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কতটা পশু দরদী ছিলেন তা মহেশ গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। মহেশ গল্পটি লেখার জন্য শরৎচন্দ্রের উপর হিন্দু জমিদাররা চটে গিয়েছিলেন, এমন কি অনেক মুসলমান জমিদাররাও খুব রেগে গিয়েছিলেন। গল্পটির জন্যে হিন্দু মুসলমান যারাই শরৎচন্দ্রের উপর চটুক না কেন, আমি নিশ্চয়ই বলতে কোনও দ্বিধা করবো না যে, মূক প্রাণীকে নিয়ে এমন সার্থক ও সুন্দর গল্প বাংলা সাহিত্যে তো নেইই, পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নামে ছোট্ট একটি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মায়ের নাম ভুবনেমোহিনী দেবী। প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র নামে তাঁর আরও ছোট দুই ভাই এবং অনিলা দেবী (দিদি) ও সুশীলাদেবী নামে দুই বোন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাবা ছিলেন অস্থিরচিত্ত ও ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ। তাই অল্প কিছুদিন চাকরি করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। ভাল গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক লিখতেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততার জন্য কোন লেখাই সম্পুর্ণ করেন নি। শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার সুত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকে সাহিত্যানুরাগ লাভ করেছিলেন। তিনি যখন স্কুলে খুব নিচু ক্লাসে পড়তেন, তখনই তিনি

স্কুলের বই ছাড়া বাবার দেরাজ থেকে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস বার করে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন- "এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বার করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরলো 'ভবানী পাঠক'। সে সব লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার জন্য ঠাঁই করে নিতে হল আমাদের বাড়ির গোয়াল ঘর।"

তাঁর বাবার লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কবিতাগুলি তিনি প্রায়ই পড়তেন। এ সমস্ত অসমাপ্ত লেখাগুলির শেষাংশে কী হতে পারত তাই নিয়ে চিন্তা করতে করতে ছেলেবেলায় নিজের মনে কল্পনার জাল বুনে বিনিদ্র অবস্থায় রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। কল্পনার এই সুত্র ধরেই শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'পিতার নিকট অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত উত্তরাধিকার সুত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল - অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা - এক কথায় সাহিত্যের সব বিভাগেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। এগুলি শেষ করে যান নি বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।'

শরৎচন্দ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স সেই সময় তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় দুই বছর পড়ার পর তিনি ভর্তি হন বাংলা স্কুলে। এই স্কুলে তিনি তিন বছর পড়েন। এই সময় শরৎচন্দ্রের পিতা ডিহিরিতে একটি চাকরী পান। তিনি ডিহিরিতে চলে যাওয়ার সময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যান। ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। ভাগলপুরের স্কুল থেকে শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাশ করে জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে যখন তিনি ফোর্থ ক্লাসে ওঠেন তখন তাঁর বাবার ডিহিরির চাকরীটি চলে যায়। তখন তিনি স্বপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন এবং শরৎচন্দ্রকে হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে ফোর্থ ক্লাসেই ভর্তি করে দেন। ১৮৯২ সালে ফার্স্ট ক্লাসে (ফাইনাল) পড়ার সময়, তাঁর বাবা অভাবের জন্য আর স্কুলের মাহিনা দিতে না পারায় স্কুলের পড়া ছেড়ে শরৎচন্দ্রকে ঘরে বসে থাকতে হয়। এই সময়েই শুরু হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা। এই সময় সতের বছর বয়সে তাঁর স্কুলের সহপাঠী কাশীনাথের নাম নিয়ে 'কাশীনাথ' নামে একটি গল্প লেখেন।

দেবানান্দপুরে মতিলালের অভাব ক্রমশ তীব্র হওয়ায়, তিনি বাধ্য হয়ে স্বপরিবারে আবার ভাগলপুরের শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র আবার স্কুলে ভর্তি হবার জন্য প্রবল আগ্রাহান্বিত হন। কিন্তু আগ্রহ থাকলে কি হবে, হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলের বকেয়া মাহিনা মিটিয়ে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনার টাকা কোথায় পাবেন? পরে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তিনি তখন ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন) চেষ্টায় শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেই স্কুল থেকেই ১৮৯৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার ফি এবং দেয় কয় মাসের মাহিনার জন্য তাঁর ছোট মামা বিপ্রদাসকে স্থানীয় মহাজনের কাছে হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার করতে হয়েছিল। এর পর তিনি দুটি টিউশন করে কলেজে ভর্তির টাকা জোগাড় করেন। কলেজে পড়ার সময় টাকার অভাবে তিনি পাঠ্যবই কিনতে পারেন নি। তাঁর সহপাঠীদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে রাত জেগে পড়ে, সকালেই সেই বই ফেরত দিয়ে আসতেন। কলেজে এভাবে দুই বছর পড়েও টেস্ট পরীক্ষার পর এফ-এ পরীক্ষার ফিস মাত্র কুড়ি টাকা দিতে না পারায়, তিনি আর এফ-এ পরীক্ষা দিতেই পারেন নি। শরৎচন্দ্র তাঁদের এই সময়কার দারুণ অভাবের কথা উল্লেখ করে পরে এক সময় লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্য এগজামিন দিতে পাই নি। এমন

দিন গেছে, যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর করে দাও, তা হলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবেনা।'

শরৎচন্দ্র কলেজের পড়া ছেড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবে অভিনয় ও খেলাধুলা করে দিন কাটাতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র একজন ভাল অভিনেতা হলেও অভিনয় অপেক্ষা সংগীতের প্রতি তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মিষ্টি। তিনি যখন মামার বাড়িতে থাকতেন, সেই সময় প্রসিদ্ধ গায়ক ও লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ির কাছেই থাকতেন। এই সুরেনবাবুর বাড়িতে প্রায়ই গানের ও সাহিত্যের আসর বসত। সংগীত ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। ওঁর কাছে শরৎচন্দ্র কিছুদিন তালিমও নিয়েছিলেন। এই সময়ই সুরেনবাবুর ভাই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি ভাগলপুরের নির্ভীক, পরোপকারী, মহাপ্রাণ আদর্শ যুবক রাজেন মজুমদারের সঙ্গে মিশে তাঁর পরোপকারমূলক কাজের সঙ্গী হলেন। পরে শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই রাজেনকেই তিনি ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করে গেছেন। রাজেন বা রাজু খুব ভাল বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা আর বেহালা বাজাতে পারত। শরৎচন্দ্র রাজুর কাছ থেকে সমস্ত যন্ত্র অল্প-বিস্তর বাজাতে শিখেছিলেন। রাজু যে যন্ত্র-সংগীতেই পারদর্শী ছিল তা নয়, নানা রকম দুঃসাহসিক কাজেও সে ওস্তাদ ছিল। রাজুর এই সব দুঃসাহসিক কাজে শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সঙ্গী এবং সহায়ক। বিভুতিভূষণ ভট্টের বাড়িতে তিনি নিজের একটা আস্তানাও করেছিলেন এবং সেই আস্থানায় বসে দিন-রাত অজস্র গল্প-উপন্যাস লিখতেন ও পড়তেন। এই সময়েই মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ, এঁদের বন্ধু যোগেশ চন্দ্র মজুমদার ও বিভুতিভূষন ভট্টকে নিয়ে একটা সাহিত্য সভা গঠন করেছিলেন। সাহিত্য সভায় 'ছায়া' নামে হাতে লেখা এক মুখপত্রও ছিল। তখনই শরৎচন্দ্র তাঁর বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা ইত্যাদি উপন্যাস এবং অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, বোঝা, হরিচরণ ইত্যাদি গল্প রচনা করেছিলেন। তবে এগুলি তখনও প্রকাশ হয়নি।

অভাবের তাড়নায় শরৎচন্দ্রের বাবা এই সময় মাত্র ২৫০ টাকায় তাঁর দেবানন্দপুরের ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে দেন, এর ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কোন রকমে সংসার চালাতেন। শরৎচন্দ্র এই সময় বনেলী রাজ এস্টেটে অল্প কিছুদিনের জন্যে একটা চাকরি করেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার উপর অভিমান করে চাকরি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়াতে থাকেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি বাবার মৃত্যু সংবাদ পান এবং ভাগলপুরে ফিরে আসেন। কোনরকমে বাবার শ্রাদ্ধ্য সম্পন্ন করে ছোটভাই দুটোকে আত্মীয়দের কাছে রেখে এবং ছোট বোনটিকে বাড়ির মালিক মহিলাটির কাছে (এর আগেই শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বিয়ে হয়ে যায়) রেখে ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় বিশেষ সুবিধা না হওয়ায়ে তিনি চাকরির সন্ধানে রেঙ্গুনে চলে যান। রেঙ্গুনে থাকার সময় বেশীর ভাগ সময়টাই থেকেছেন শহরের উপকণ্ঠে বোটাটং-পোজনডং অঞ্চলে। এখানে প্রধানত থাকত শহরের কল-কারখানার মিস্ত্রীরাই। শরৎচন্দ্র তাদের সঙ্গে অবাধে মেলেমেশা করতেন। তিনি তাদের চাকরির দরখাস্ত লিখে দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতেন, অসুখে বিনামুল্যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন, বিপদে আপদে সাহায্যও করতেন। সে কারণে তারা তাঁকে ভীষণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করত এবং ডাকত 'দাদাঠাকুর' বলে। শরৎচন্দ্র এদের নিয়ে একটি সংকীর্তনের দলও গড়েছিলেন।

এই মিস্ত্রী পল্লীতে থাকার সময় তিনি শান্তি দেবীকে বিয়ে করেন। এঁদের একটি শিশুপুত্রও হয়। পুত্রের বয়স যখন এক বছর, সেই সময় রেঙ্গুনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী এবং শিশু পুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে শরৎচন্দ্র খুব শোকাহত হয়ে পড়েন। শান্তি দেবীর মৃত্যুর কয়েক বছর পর রেঙ্গুনেই তিনি মোক্ষদা দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি মোক্ষদা দেবীর নাম বদল করে নাম দেন হিরন্ময়ী দেবী এবং সেই থেকে এই নামই প্রচলিত হয়। হিরন্ময়ী দেবী যখন রেঙ্গুনের মিস্ত্রী পল্লীতে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় হয়। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরন্ময়ী দেবীর বাবা একদিন তাঁর মেয়েকে নিয়ে

শরৎচন্দ্রের কাছে এসে তাঁকে বলেন - 'আমার মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই মেয়েটিকে গ্রহন করে আমার দায়মুক্ত করেন তো বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো আমাকে কিছু টাকা দিন, আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।' হিরন্ময়ী দেবীর বাবা শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও তিনি বিশেষ ভাবে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন তিনিই যেন মেয়েটিকে গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও হিরন্ময়ী দেবীর বাবার একান্ত অনুরধে তিনি হিরন্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন। হিরন্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বিয়ের সময় পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া জানতেন না। পরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। হিরন্ময়ী দেবী ছিলেন শান্ত-স্বভাবা, সেবাপরায়াণা ও ধর্মশীলা। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখে শান্তিতেই কাটিয়ে গেছেন।

১৯১২ সালে তিনি এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তখন যমুনা-সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। পরিচয় হলে ফনীবাবু বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাঁর কাগজে লেখার জন্য। তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। সেই অনুযায়ী রেঙ্গুনে গিয়ে 'রামের সুমতি' গল্পটি পাঠিয়ে দেন। ফনীবাবু এই গল্প তাঁর কাগজে ডিসেম্বর মাসের সংখায় প্রকাশ করেন। তিনি একটি গল্প লিখেই একজন মহাশক্তিশালী লেখক হিসাবে সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত হয়ে যান। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল। বিভূতিভূষণ ভট্টর বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের লেখার খাতা থেকে 'বড়দিদি' (শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস) নকল করে এনেছিলেন এবং শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই তা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হওয়ার পর 'ভারতবর্ষ' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার তরফ থেকেও তাদের কাগজের জন্যে লেখা চাইতে থাকে। এই সময় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্যেই তিনি বিশেষভাবে লিখতে থাকেন। এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যন্ড সন্স তাঁর বই প্রকাশ করতে শুরু করে দেন।

১৯১৬ সালে শরৎচন্দ্র হঠাৎ দুরারোগ্য পা ফোলা রোগে আক্রান্ত হন। তখন স্থির করেন অফিসে এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় কবিরাজী চিকিৎসা করাবেন। কিন্তু অফিসে ছুটি না দেওয়ায় তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বরাবরের জন্যে রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া নেন। হাওড়ায় বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রায় দশ বছর থাকেন। এর পর সামতাবেড়ায় জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করে ১৯২৬ সালে সেই বাড়িতে চলে আসেন। এর মধ্যে তাঁর মেজভাই প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম ছিল স্বামী বেদানন্দ। ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে নিজের কাছে রেখে তাঁর বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী করে দেন।

হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়টাকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তবে সাহিত্য সাধনায় শরৎচন্দ্রের কুঁড়েমির শেষ ছিল না। লেখার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে কতটা কুঁড়ে ছিলেন, তা মাসিক কাগজের সম্পাদকরা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। কোনও কাগজের জন্যে লেখা পেতে হলে সম্পাদককে কতবার বৃথা তাঁর বাড়িতে যেতে হত তার সীমা ছিল না। সাধারণ কাগজের কথা তো দূরে থাক, যে 'ভারতবর্ষ'এ প্রধানত তাঁর উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বেরোত তার সম্পাদককে মাসে অন্তত পনের-কুড়ি দিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে ধরণা দিয়ে পড়ে থাকতে হত।

শরৎচন্দ্রের একটা লেখা পাওয়ার জন্যে 'বিজলী' সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার সপ্তাহে অন্তত একদিন করেও একটানা দুই বছর হেঁটেছিলেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। যখন দুই বছর হেঁটেও লেখা পেলেন না, তখন অন্যভাবে মতলব করে তিনি লেখা আদায় করেছিলেন। সে ব্যাপারে নলিনীকান্ত সরকার নিজেই লিখেছেন, 'আমি কাতরভাবে বললাম, 'দাদা এই সম্পাদকী করে যা মাইনে পাই, তাতে সংসার চলে না, তার জন্যে প্রাইভেট টিউশন করতে হয়।

শুনলাম রামকৃষ্ণপুরে একজনের বাড়িতে একটা টিউশন খালি আছে। এও শুনেছি, তিনি আপনার খুব পরিচিত। আপনি দয়া করে যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু বলে কয়ে দেন। দুঃখী-দরদী শরৎচন্দ্র আমার কথা শেষ না করতে দিয়েই বললেন - চল এখুনি যাব। একটি খদ্দরের বেনিয়ান পড়ে ও একগাছি লাঠি নিয়ে উঠে পড়লেন। আমি একরকম জোর করেই তাঁকে ট্যাক্সিতে তুললাম। ট্যাক্সি চলেছে সবেগে। রামকৃষ্ণপুর পার হয়ে ট্যাক্সি যখন হাওড়া ময়দানে, তখন উনি বলে উঠলেন ওহে রামকৃষ্ণপুর যে ছাড়িয়ে এল। আমি বললাম চলুন না। শরৎদা এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন 'কোথায় যাচ্ছ বলতো?' আমি কোন উত্তর দিলান না। ট্যাক্সি এসে ঢুকলো পটুয়াটোলা লেনে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে শরৎদাকে নিয়ে সেই বাড়িতে উঠলাম দোতলার একটি কামরায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় আনলে বল তো?' সেই ঘরের মধ্যে তাঁকে একখানি চেয়ারে বসিয়ে, সামনের টেবিলে দুখানি টোস্ট, দুটি ডিম, এক প্যাকেট সিগারেট, এক পেয়ালা চা, একখানি দেশলাই, একখানি রাইটিং প্যাড ও দোয়াত কলম দিয়ে বললাম, লেখা হলে নিষ্কৃতি। বলে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলাম। এইটে আমার মেস। মেস শুদ্ধ লোক শরৎচন্দ্রের বন্দিদশার কাহিনী শুনতে লাগলেন। প্রায় তিন ঘন্টা পরে দরজায় ধাক্কা লাগিয়ে তিনি চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন, ওহে নলিনী, দরজা খোল, তোমার লেখা হয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যিই এক অপুর্ব লেখা হয়েছে। প্রতারিত হওয়ার জন্য রাগ নেই, বন্দী হয়ে থাকার জন্যে বিরক্তি নেই, বরং স্বভাব-সুলভ হাস্যপরিহাস করতে করতে আমাকে নিয়ে তাঁর শিবপুরের বাড়িতে ফিরে গেলেন।'

বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয়। পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে বিচিত্রার আসরে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি বিচিত্রার আসরে তাঁর 'বিলাসী' গল্পটি পড়েছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে আরও ঘনিষ্টতা হয়েছে। শরৎচন্দ্র একাধিকবার নানা প্রয়োজনে শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেছেন কবির সাথে দেখা করতে। শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ি করলে সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি একবার গিয়েছিলেন। কবির সত্তর বছর পূর্তিতে দেশবাসী যখন কলকাতার টাউনহলে তাঁকে অভিনন্দন জানায়, সেই অভিনন্দন সভার বিখ্যাত মানপত্রটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কবি নিজেও একবার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বাজে শিবপুর ছেড়ে যখন তিনি সামতাবেড়ায় বাস করতে থাকেন, তখন থেকে সেই অঞ্চলের দরিদ লোকেদের অসুখে চিকিৎসা করাটা তাঁর এক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। রোগী দেখে তিনি শুধু দাতব্য করতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। বাজে শিবপুরে থাকার সময়ও এই রকম কাজটি করতেন। তিনি সামতাবেড়ায় অনেক দুঃস্থ পরিবারকে, বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থ সাহায্য দিতেন। তবে সেখানে থাকাকালীন তিনি ৩/৪টির বেশী গ্রন্থ রচনা করতে পারেন নি।

১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতার বালীগঞ্জে একটি বাড়ি তৈরি করেন। তখন থেকে তিনি কখনও কলকাতায় এবং কখনও সামতাবেড়েতে-এভাবেই দিন কাটাতেন। জীবনের শেষদিকে তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভীষণ অসুখে পড়লেন। তাঁর পাকাশয়ের পীড়া দেখা দিল। এই সময় তিনি সামতাবেড়ের বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে চিকিৎসা করাবার জন্য তিনি কলকাতার বাড়িতে এলেন। কলকাতার ডাক্তাররা এক্সরে করে দেখলেন, তাঁর যকৃতে ক্যান্সার হয়েছে। এ সময় তিনি উইল করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে দান করেন। হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যর পর সেই সম্পত্তির অধিকারী হবেন তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের পুত্র বা পুত্ররা। হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন।

কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ট চিকিৎসকেরা - ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি - শরৎচন্দ্রকে দেখে স্থির করেন তাঁর পেটে অপারেশন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। শরৎচন্দ্রকে একটি ইউরোপীয়ান নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর নেশার বস্তু সিগারেট খেতে না দেওয়ায় তিনি কষ্ট বোধ করেন। নার্সিং হোমে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কাউকেই দেখা করতে দেওয়া হত না। এ ছাড়া ইউরোপীয় নার্সরা এদেশীয় বলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নাকি

ভাল ব্যাবহার করত না। এই কারনে দুই দিন পরে, সেখান থেকে চলে এসে তাঁর আত্মীয় ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জীর 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হন। সেই সময়কার বিখ্যাত সার্জন ললিতমোহন ব্যানার্জী তাঁর অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু তাতেও তাঁকে বাচানো সম্ভব হয়নি। অস্ত্রোপ্রচারের চার দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর চার মাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন, "যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভুতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে আমিও দেশবাসীর সঙ্গে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।" এর কয়েকদিন পর তাঁর মৃত্যুতে তিনি লেখেন -

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

****

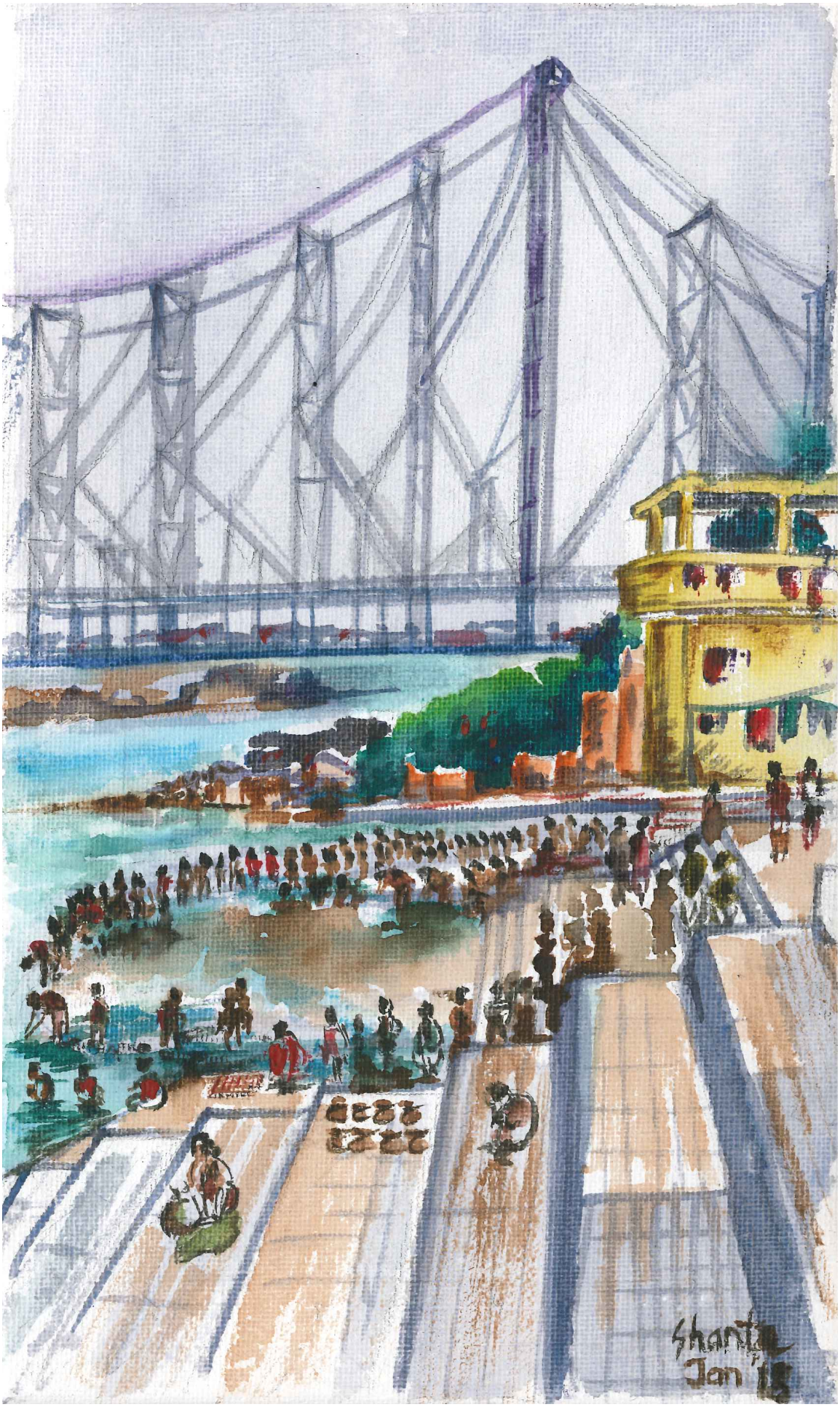

Artist: ***Shanta Basu***

আমার সুন্দরবন

লেখার গুণটা আমার তেমন নেই। তাছাড়া বাংলা না লিখে, আজকাল বানানে.....। আর নামধামও আজকাল ভুলে যাই। তবু চেষ্টা করছি।

আমি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরের বাসিন্দা। দু বছর অন্তর একবার কলকাতায় যাই। এই রকমই একটা ট্রীপে আগের থেকে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমাদের দলে, আত্মীয়-বন্ধু মিলিয়ে, প্রায় ২২ জন ছিলো। দক্ষিণ কলকাতার মহেশতলা ডাকঘরের উল্টোদিক থেকে একটা travel এজেন্টের মিনিবাস আমাদের সকাল সাতটা নাগাদ তুলে নিলো। কোন রাস্তা দিয়ে গেলো, তা এখন আর কিছুই মনে নেই। প্রায় দু-আড়াই ঘন্টা চলার পর একটা stop দিলো। চা খেতে নামলাম আর সাথে মিললো একটা নতুন জিনিষ, যা আমি আগে কখনো খাই নি --- পেটারুটি, সঙ্গে আলুর দম। আধ ঘন্টা মতো জিরিয়ে আবার দৌড়। এবারে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে এসে গেলো মাতলা নদী। স্থলযান ছেড়ে উঠলাম জলযানে, মানে নৌকায়, ভ্রমণ। আমার মতো মোটা মহিলার জন্য, নৌকায় ওঠাটা একটু adventurous ছিলো, কিন্তু একবার উঠে গেলে প্লাসটিকের চেয়ার-টেবিলে চা ও খাবারের আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিলো না। বেশ কিছু সময় নদী বক্ষে ভ্রমণ করে গিয়ে পৌছলাম সুন্দরবনের সজনেখালির পাশের একটা গ্রামে, উঠলাম একটা গেস্ট হাউসে। অনেকে ছিলাম তো, তাই আড্ডা, হইহই করে রাতটা কেটে গেলো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গলো দরজার কড়া নাড়ায়। দরজা খুলে দেখি একজন খেজুরের রস বেচতে এসেছে। রসটা তখনো গরম, মানে সদ্য নামিয়েছে। কি তার স্বাদ!

ছিলাম ওখানে দু দিন। একদিন একটু হেটে আশপাশটা দেখলাম। মন মাতানো বাংলার গ্রাম আর তার অসাধারণ, সরল মানুষজন।

পরেরদিন একটা নৌকায় গেলাম বাঘ দেখতে। দিনটা বেশ কেটেছিলো, বাঘ দেখতে গিয়ে আরও কতো কি দেখলাম---কুমির, ভোদর, সারস, বক, আর কিছু হনুমান আর বাদর। একটা মজার ঘটনা বলি। আমরা নৌকায় উঠে প্রাতরাশ করছি। দেখি ঘাটে একটা হনুমান বসে আছে। আমরা একটা লুচি ওকে ছুড়ে দিলাম। হনুজি কাদার থেকে সেটা তুলে জলে ভালো করে ধুয়ে/ভিজিয়ে তবেই সেটা খেলো।

এই trip এ আরেকটা নতুন জিনিষের অভিজ্ঞতা হলো---- রিক্সা ভ্যানে যাত্রা। ফেরার পথে, এই ভ্যানেই আমরা খানিকটা এসেছি। তারপর গোসাবা থেকে ফেরি পার হয়ে আবার মিনি বাস।

আগেই বলেছি, একসাথে অনেকে ছিলাম বলে এতো আনন্দে কটা দিন কাটিয়েছি বলার না। আমার ক্যামেরার দুটো lens ছিলো সাথে। যেটা আমি বেশি ব্যবহার করবো ভাবছিলাম, সেটা যাত্রা শুরুর একঘন্টার মধ্যেই বেকে বসলো। সারা trip তাই একটা macro lens দিয়ে কাজ সারতে হয়েছে। মানসিক ভাবে তাই আমি একটু দমে ছিলাম। কিন্তু বন্ধুবাধব সকলের সান্নিধ্যে সব দুঃখ ভুলে শুধু আনন্দেই মেতেছি।

– সুদেষ্ণা চ্যাটার্জি

Probasee Annual Play

Original Playwright: Subhash Basu ***Re-written & Directed by: Shibashis Dutta***

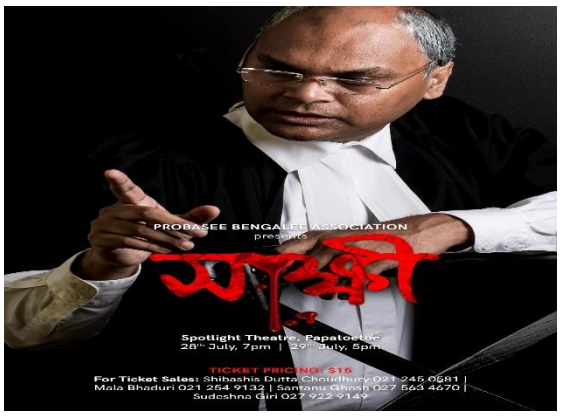

A whodunit story which awakened the latent Pheluda or Byomkesh in all of us, this year's play had all the twists and turns of a rollercoaster without the sweat. The audience was left rapt with the suspense stretching till the very last moment!

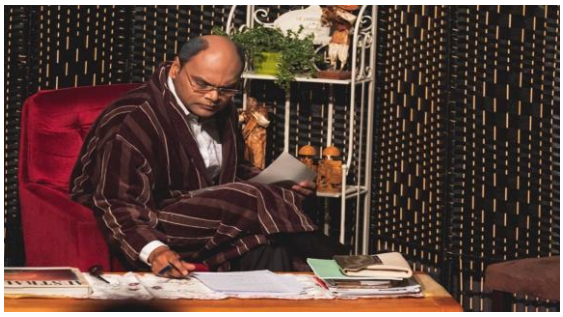

Poncho Kobi Loho Pronam 2018

A tribute to the five Great poets of Bengal, Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, Jibananda Das, Atul Prasad and Dwijendra Lal Roy, through a wonderful mix of songs, extempore, recitation and dance.

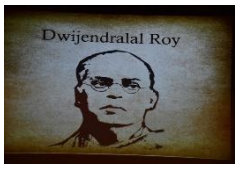

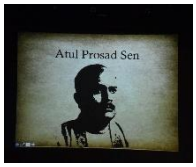

Anondomela -2018

কবিতাগুচ্ছ

স্বস্তিকা গাঙ্গুলি

এলোমেলো পাখি

মনের মাস্তুলে বসা সেই এলোমেলো পাখি
বৈশাখী রোদ মেখে করে ডাকাডাকি।

কি হে কেমন আছো বুকের ভিতর
স্বপ্নের সাথে কতটুকু বেঁধেছ বাসর!

হৈ হৈ ক'রে এলো যেই সুরের আগুন
মন ছুঁয়ে গেল বুঝি অধরা ফাগুন।

তবুও আশা ছাড়েনা বিকেলের হাওয়া
তাই তার নিয়ত গোধূলির গান গাওয়া।

এভাবেই চলল মধুর ভাবের আসর
পলাশের ডাল ভেঙে নাগরের ঘর . . .

ছিন্ন হলো যেই মনের দীর্ণ দুয়ার
অভিমান সরে এলো সখ্য জোয়ার।

তবুও কি নিস্তার আছে বাধার মেঘে
চিন্তার ঝড়ে নাচা ভয়ার্ত আবেগে।

ইতিউতি চাহুনি শেষ রাতে মাখে চাঁদ
এই বুঝি ভোর এসে সব করে বরবাদ।

মানানসই

গোলাপের কাঁটা আছে আক্রমণের,আত্মরক্ষার;
অহংকারহীন রজনীগন্ধার সেসবের নেই দরকার,
যদিও দু'জনেই রূপ রঙ গন্ধে মন কাড়ে সবার,
মৌমাছির হুল সেই একই প্রয়োজনে, ওদিকে
আবার প্রজাপতির সহ্যশক্তির প্রেম অপার।

অথচ কি বিভ্রাট! পরিণতির পরিহাস,
গোলাপের সাথে প্রেম হলো প্রজাপতির,
মৌমাছির সাথে রজনীগন্ধার, এ বুঝি সুখের
সূত্রপাত নয়, সচেতন করেনি অতীত হতে
চাওয়া বর্তমান ভবিষ্যতে যার ফলদান।

আবেগ কৌতূহল শেষে একে অপরের
অভিনিবেশে মতান্তরে ভেসে গেল,
ছোটো ছোটো চাহিদার অ-বনিবনায়,
নির্যাতন বনাম ত্যাগ এই হলো শান্তির উপায়,
মুখ বুজে মেনে না নিলে দুরূহ বিপদ।

যদি গোলাপের সাথে মৌমাছির আর
প্রজাপতির সাথে রজনীগন্ধার মিলন হ'তো,
তাহলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ ও
ভুবনজয়ী প্রেম লিখে যেত ইতিহাস বারবার।

বুঝিবা প্রথমটি হয় টিঁকে যেত সমানে
সমানে টক্করে, কিংবা বিচ্ছেদে বিকল্প খুঁজে
নিতে চেষ্টা করত অবিরত, অথবা মেনে মানিয়ে
অনুপ্রেরণা হতো অনভিজ্ঞ মহলে একাধিকবার।

মনমতো কিছু বুঝি হয় না জীবনে!
কিছু পাওয়া, কিছু হারানো, কি দিয়ে কি পেলাম
এ হিসাবের হাত না ধরা, এই নিয়ে জীবনের গদ্য
লেখা ভবিতব্য হয়ে যায় যদি ক্ষনস্থায়ী যাপনে!

কোন মনে ভর্তি কাঁটা বা অঢেল পালক
পরিচয়ের শুভদৃষ্টিতে তা কি যায় বোঝা!
যদি যেত তবে দুঃখ ব'লে কিছু থাকত না পৃথিবীতে
সুখেরও কোনো দাম থাকত না একঘেয়েমির
কারণে বোঝা হয়ে বুঝিয়ে না দিলে অভিজ্ঞতায়।

মর্জি তোমার আমার প্রেমে

খুব তো কাছে চাইছিলে
এখন কেন বিরক্ত!
প্রেম বিরহ দুটোতে বুঝি
হওনি এখনো আসক্ত।

তোমার মতে পরিমাপে
সময় মেপে নিক্তিতে,
আসতে কি আর পারি বলো
অশ্রদ্ধা বা ভক্তিতে।

আমার অনেক দায় দায়িত্ব
অসংখ্য রকম ভক্তকুল,
সবাইকে করা সন্তুস্ট
একা হাতে হয় না ভুল একচুল।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বর্ষারানী
দাসী বাঁদী কারো নই,

পথের ধুলোয় গড়াই যখন
পাঁকে পচি খোঁজ রাখো কই!

সুষম রূপে চাইছ ঠিক
তুমি কি নিয়ম মানো,
জল অপচয় করো না কি
কত জীবন জলকষ্ট পায় জানো!

তাই তো আমি গ্রীষ্ম বর্ষা
নানা রূপে আসি,
চিনতে এবং চেনাতে কদর
খরায় বা বানভাসি।

মেনে নিও মানিয়ে নিও
চাওয়া এবং পাওয়াতে,
নইলে দেখবে যথেচ্ছাচার
বিব্রত ঝড় হাওয়াতে।

প্রতিবাদ

আমি মূর্খ!
একবারও ভেবে দেখেছ তার কারণ?
যদি বলি,
তোমাদের সমাজ আমাকে মূর্খ ক'রে রেখেছে --

তোমাদেরই স্বার্থে,
তোমাদের লোক ঠকানোর বুদ্ধি
শোষণের চাবিকাঠির খোঁজ দেবেন তাই।
কুক্ষিগত শিক্ষার আলোতে বুঝি শঠতার-বিষ
নিগড়ে নেওয়ার মন্ত্রবীজ!
অতশত বুঝিনা -----
তবে অন্যে বাঁচুক মরুক
জানা হয়ে যায় নিজের বাঁচার উপায়।
এসব সইব না আমি -----
ধ্বংস হতে হলে ধ্বংস ক'রে যাবো,
নিজের বিষাক্ত রক্ত দিয়ে যাবো
সমাজের শিরায় মজ্জায়,
অহেতুক-প্রয়োজনীয় কামনায়
সৃষ্টির উল্লাসে।
কানে তার মন্ত্র দিয়ে যাবো -----
বিষাক্ত গ্যাসের মতো আকাশে
বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়ার,
দুর্বলকে সঙ্গী করার,
উদ্ধতকে ধ্বংস করার বুদ্ধি।
অনুপ্রাণিত ক'রে যাবো -----
একবিন্দু শতবিন্দু হয়ে

দুর্নীতির রাজ্যে, শোষণের স্তূপে
প্রতিবাদ-বারুদ হয়ে ফেটে পড়ার।

India 1970's....

All those who are about to read this article may not necessarily have been even born in the years that are referred too or even lived through the decade in India. The younger generation wouldn't know much about the building years after India's independence. The millennials would not be interested would be my guess. It isn't my endeavour to give you all a lesson in history. But on the other hand, there could be many of us who have lived through one of the most interesting and turbulent times in India. It is time to reminisce.

One would have to admit that every country has their own 'history'- rich with facts.. India isn't too far behind I am sure you all would agree. Even I cannot go back in time; too far behind except in the 70's as that was the decade when I was born. It was the peak of the 'black and white' era. I mean this in many senses not just the television, but also the press.

I guess in the 70's a few things synonymous to the urban middle class not in everyone's house was the famous big black granny rotary phones which were as heavy as paper weight, the most famous box TV's in India were EC, Uptron and Salora to name a few. Most families who were interested in music had an old 'turn table' and a collection of 'records' or 'vinyl' as they are referred to in modern times. Most houses had a 'radio'. One company that I remember had a presence in India was 'Bush'. My father had a twin band Bush radio.

In Calcutta most houses cooked on coal burners. These clay burners were omnipresent in almost every house hold. The next best thing one would have is the 'kerosene stove'. In my house I remember that all our utensils were made of 'Hindelium'. Many a household would have the foot sewing machine – company being 'Singer'. The dress code was Bell Bottom Pants. the real fashion of those days for men. Boys & men would prefer not to go for a hair- cut for at least 6 months. Barbers Profession was put out of place by fashion & trends of those times. People did keep long hair and they would wear stylish glasses. My mother wore glasses and she would have a thing called 'attaché'. Women generally wore saris and the more trendy would wear bell bottom pants and fashionable tops with stylish sandals. I guess in north India the dress code would have been salwar kameez and it still is today.

If we call the first few days of 'houseful' for any 1 crore club movie as 'craze for movies', we can say there were movie halls in 1970s outside which people plunged and fought for movie tickets. Many of these cinema houses were in the last years as the buildings were turning into 'relics'. For college students the class bunking was almost ten times in 1970s than what it is today. The 1970s era of cinema is what we may say as a decade of real movie-madness..not just in India but in many parts of the world. For Indians who tend to share haphazard feet movements in festivals after sipping alcohol, the 1970s era provides perfect songs like "Jai Jai Shiva Shankar" and again for romantic parties where one wishes to sit and enjoy wine, the 1970s had the ideal offer of songs like Baahon me Chale Aao and Chur aliya hain tumne jo dil ko, and O mere dil ke chain. The most successful movies of Indian cinematic history – Sholay was a released August 15th 1975. If you are an Indian citizen under living in any corner off the globe you would have watched it.. not just once but on numerous occasion I am sure. And it goes without saying the Bengali cinema had some its best at work over the decade – Uttam Kumar and Suchitra Sen, director of the calibre of Satyajit Ray and playback singer Hemant Kumar and Suchitra Mitra. Music, Films, theatre and outdoor events was the chosen path in those days. Social life was at its peak. Human interaction, In-fact children used to play outside on the fields, parks and gardens. They would play until they would hear their mothers call well after sunset.

Cricket, India always breathes Cricket and at that point in time the Indian cricket boast of some legends off the game. Players of the stature of Ajit Wadekar, Bishen Singh Bedi, Venkatraghvan, Gundappa Vishwanath and Sunil Gavaskar to name a few. A name that is synonymous with everyone is Kapil Dev, arguably the best medium pace bowler India has had until today made his debut in 1978. Surely you all know that Eden Gardens stadium stood then and still stands today. It was more used to host two of Bengals prominent football clubs – Mohan Bagan and East Bengal. In Bombay we had the majestic Wankhade Stadium and the Brabourne Stadium.

In terms of modes of transport, the two very prominent cars in India at the time were the Fiat and Ambassador. There were a couple of versions of the Fiat. There was also a car by the name 'Standard'. If I am to talk about Calcutta as a city - Calcutta

had more jam-packed streets, cobble stone roads, muddy tracks which had not yet been tarred. The famous trams ran not just in Calcutta but was also present in Bombay. Calcutta then had nearly 300 trams on its streets. There were the big blue and also red double decker buses that would ply at a tilt of an angle more than 90 degrees, which was anything less than standing upright. The buses and trams and local trains would be jam packed with modest people making their way through their daily living. One feature that is still present on the street corners in Calcutta are the huge borewell hand pumps. Steam engines were still going strong in most parts of India. But also making debut were the Diesel engines and the electric engines with the slow and gradual electrification projects in several pockets of India. Case to be – the famous Deccan Queen would be pulled by the famous WCM1 engines which were manufactured in Great Britain. They were from 'The English Electric Company in London'. The yellow cabs in Calcutta were there then and are still there today – the car model then was the Ambassador, which is now on dying breed as it is not manufactured any longer. People who owned scooters owned either a Girnar or Vijay made by Bajaj. There would also be the rare Italian make – Lambretta.

The Indian currency notes were the famous 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees and 100 rupees notes. Not many will be aware that in the seventies and even prior the Indian currency had five thousand rupees notes and ten thousand rupees notes as well which were in circulation between 1954 and 1978. There were some very historic coins in circulation as well the old 5 paisa, 10 paisa, 20paisa, 25 paisa and the 50paisa coins. Rs 1,000 and higher denomination notes were first demonetised in January 1946 and again in 1978. The highest denomination currency notes ever printed by the Reserve Bank of India **was** the Rs 10,000 note in 1938 and again in 1954. But these notes were demonetised in January 1946 and again in January 1978.

All said and done this was a general introduction. A sense of 'calm' before the 'storm'. After the comparative calm of the decade that went prior the 70's and life in India in the 70's was like a dizzying roller coaster ride. It was more the socio-political scene that had gut wrenching reality and its ups and downs pinned to it. Must also add that by the time the decade came to an end the ride still hadn't ended. History rarely divided itself into neat ten- year packages. In the Indian context, events somehow conspired to do just that. India suffered the trauma of another war with Pakistan. Despite emerging victorious, it was bloodied. It accepted rudely, rejected a dictatorship. India also had its first nuclear

test, nuclear bomb and upped its international prestige.

The decade at a glance : a period of shatte

If any one individual had the distinction of dominating the decade's headlines it was undoubtably Indira Gandhi. Mrs Gandhi started off the decade by signing the treaty of Friendship with the Soviets, the then USSR and India's foreign policy took a dramatic turnabout. Her tough stance against Bangladesh or East Pakistan; war that followed only confirmed what had been evident for some time that she was the lady – with the Iron Fist. Following India's victory in the fourteen-day war Mrs Indira Gandhi was honoured by V. V. Giri President of India; the Bharat Ratna, nations highest award. It was Mrs Gandhi who put India on the nuclear Map. In October 1971, the BARC (Bhabha Atomic research Centre) produced Uranium, and Hindustan Aeronautics presented the Indian Air Force with the first indigenously built MIG – 21. Mrs Indira Gandhi it was, the supreme court upheld her decision to abolish the princely states and privy purses. By the end of the decade we also ended up with the French supplying is with their Mirgae aircrafts as well. I still remember the old Air force base in Pune at Lohegaon which would run sorties and exercise through the skies over the city.

India also inadvertently put itself on the International Hijack map when on January 30th 1971, and Indian Airforce Fokker Friendship F-27 aircraft named Ganga flying from Srinagar to Jammu was hijacked by two Kashmiri separatists belonging to the Jammu and Kashmir Liberation Front. The aircraft was flown to Lahore, Pakistan, the crew and passengers were released, but the aircraft was burnt on 01st Feb 1971. India retaliated to the hijacking and subsequent burning off the aircraft by banning any flights over Pakistani airspace. This overflight ban had a significant impact on troop movement during the War. In March 1971, Mrs Gandhi, put the final seal on her political dominance by storming imperiously back into power in the general elections with a steamroller majority. Her party captured a two thirds majority by winning 350 seats in the Lok Sabha. Even the blood-spattered Naxalite movement took its last gasp and died at the same time as its founder Charu Mazumdar died in jail in Calcutta. In sequestered Shimla; Mrs Gandhi and Mr Zulfikar Ali Bhutto went through the

motions of signing an agreement in June 1972, to remove the use of force in resolving differences. It was then that Bhutto's daughter, the coltish Benazir Bhutto caught the eyes of the photographers who followed her around.

India also celebrated a quarter century of independence and a massive crowd thronged at the historic Red Fort for the traditional Independence Day celebrations. The next big political upheaval or social cry were the 'Price protests'. India also was in the grip of 'industrial strike' actions across the country. One such gripping strike which gave birth to yet another political leader was the Railway strike. The person to whom I refer is Mr George Fernandes, who was a then Union Leader. The year was 1974. Even Air India pilots joined the fray. India was plagued with Labour unrest across various parts of India. India registered an all-time high of 40 million-man days lost by the end of 1974.

Mid way through the decade 1975 India made its foray into Space and Satellite technology by launching 'Aryabhatta' in April. There were also territorial acquisitions with Sikkim joining the Indian Union as the 22nd state in May. But it was the judicial arena which really set the stage for perhaps the most momentous event of the decade – The Emergency. In June that year in the Allahabad High Court the little-known Justice Jagmohan Lal Sinha set aside Mrs Gandhi's election to the Lok Sabha. A fortnight later the opposition party leaders announced a nation-wide satyagraha to force Mrs Indira Gandhi to step aside from power. Mrs Gandhi's reply was swift and savage. A state of emergency was declared on June 26th 1975. The 19 months that followed will possibly go down as the darkest chapter of India's democratic history. 'Indira is India' became that catch word phrase during the emergency thanks to the rise of new political stars on the horizon, the likes of Sanjay Gandhi, V.C. Shukla (Vidya Charan Shukla), Bansi Lal and Om Mehta – India's infamous Gang of Four. The year was 1976 and India also witnessed the biggest mine disaster in its history at Chasnala in Dhanbad (Bihar). An explosion and flooding in the mine lead to the death of over three hundred mine workers in one single disaster.

अडवानी, चरण सिंह गिरफ्तार

THE HINDU

India's National Newspaper

President Proclaims National Emergency

"Security of India Threatened by Internal Disturbances"

Preventive Arrests: Press Censorship Imposed

PM Explains Action

By the start of 1977, the Emergency restrictions had been lifted. The fragmented opposition party formed a new party called the Janata Party and Mrs Gandhi's party was unceremoniously ejected and they took over the reigns of the country under the octogenarian Mr Moraji Desai. Once again politics took its own toll. The setting up of the Shah Commission to uncover the dark deeds of the Emergency backfired. On the Industrial front George Fernandes decided that India could do without companies like IBM and Coca Cola. They were banned. It was, in retrospect a time of political madness. The ruling party fumbled from crisis to crisis and bestowed on a grateful Mrs Indira Gandhi the halo of a martyr by bungling her arrest in October 1977. The year end saw a nation gripped in deep despair.

In 1978 on 01st January Air India, India's leading flagship lost one of it Boeing 747 Aircraft Emperor Ashoka which fell into the sea off the coast of Bombay killing 213 people on board. Air India Flight 855 was a scheduled passenger flight that crashed during the evening of New Year's Day 1978 about 3 km (1.9 mi) off the coast of Bandra. The crash is believed to have been caused by the captain having become spatially disoreiented after the failure of one of the important Flight Instruments in the cockpit. It was the deadliest aircraft crash until the bombing of Flight 182 in 1985. It was also the deadliest aviation accident in India until the Charkhi Dadri mid-air collision.

Another event that took place on the political front in 1978 was the formation of Congress I. Mrs Gandhi broke away from Congress Party to start her own. The last year of the decade, 1979 reflected the growing anger at the political upheaval and turmoil that India was going through. 1979 was a precussor to the start of the next ten years in India political and socio-economic history. Political parties were falling out of contention left right and centre. Mr Moraji Desai belatedly handed in his resignation as leader of JD and was succeeded by Jagjivan Ram Reddy. Mother Teresa. The 'saint' the crusader for the homeless and the founder of 'Missionaries of Charity' in Calcutta was awarded the Noble Peace Prize, but it was only faint glimmer at the end of a long dark ten years.

In retrospect, it turned out to be a decade more devastating than any other in India's history. It was tragically a period when turning the clock back seemed more desirable than open the Pandoras box – the 80's.

– Shopan Dasgupta.

আমার দুর্গা

সোহম সরকার

আমার দুর্গা দশভূজা নয়।

তবু হরেক রকম কাজ।

এক হাতে সে সামলায় অফিস,

আরেক হাতে সংসার।

আমার দুর্গার যুদ্ধ এখন

আর অসুরের সাথে নয়।

আমার দুর্গার সংগ্রাম রোজ

সমাজের সাথে হয়।

আমার দুর্গা বাপ-মা মরা।

সেই ছোট্ট একটা মেয়ে

ভাইয়ের পড়ার খরচা চালায়

মাথায় ইঁটের বোঝা নিয়ে।

আমার দুর্গার চুলে হাইলাইট,

ট্যাটু-সজ্জিত পিঠ।

অনিয়মই তার নিয়ম,

তাই বিতর্ক নিক ব্যাক-সিট।

আমার দুর্গা নিজের মেয়ের

চিতায় আগুন দিয়ে,

সেই কষ্ঠ চেপে, হাসিমুখে থাকে

নাতিদের দিকে চেয়ে।

আমার দুর্গা আশি ছুঁই ছুঁই,

চলাফেরা করা দায়।

মন এখনও যে বাইশেই থেমে।

দৌড়ে বেড়াতে চায়।

আমার দুর্গা রোগে ভোগে,

আমার দুর্গা কাঁদে,

আমার দুর্গা দুঃখ ভুলে

আনন্দেতে হাসে।

আমার দুর্গা বন্ধু আমার,

মা, মাসি, দিদা, বোন।

আমার দুর্গা পুজো বছরব্যাপী।

দুর্গা যায় না বিসর্জন।

বন্ধু

তুমি আমার প্রাণের বন্ধু
গানের বন্ধু জানি,
দুঃখের দিনে তুমি যে মোর
ধরো গো হাতখানি।
তোমায় আমি দুঃখের বন্ধু,
সুখের বন্ধু মানি।
বন্ধু আমার ভক্ত আমার, আমার গানের সাথী ,
প্রদীপ জ্বেলে তোমার তরে বরণমালা গাঁথি।
একলা চলার সঙ্গী তুমি,
নিঃস্ব আমার সহায় তুমি,
বন্ধু আমার ভক্ত আমার ভালোবাসার ধান,
কান্না হাসির দোসর আমার
লও হে তুমি সালাম আমার,
লও হে নমস্কার
নমি তোমায় নমি আমি, নমি শতবার।

- রানী আকলিমা

ঝিলিক

সুদেষ্ণা গিরি

হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি সাথে ,দম্কা হাওয়ার আনাগোনা
অবশ্য তার মাঝে এক ঝিলিক রোদ্দুর ।
রাস্তায় চলার পথে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ,একটি বন্ধ চায়ের
দোকানের সামনে -
ছাতা হাতে ছিল বটে , তবে হঠাৎ এক দম্কা হাওয়ায় উল্টে
গেলো ।
দোকানের এক কোনায়, এক জোড়া শালিকের
কথপোকথন-
এই এক পশলা বৃষ্টির মধ্যে ,একটি মিষ্টি ঝগড়ার অনুভূতি ।
কিছু কি মনে পরিয়ে দেয়- সেই প্রথম দেখা হওয়া ,
সেই একরাশ ঘন বেণীবাঁধা কেশ ,আর মায়ামাখা হরিণী চোখ
মনের কোণে হালকা ব্যাথা,সেই প্রথম আর শেষ দেখা -
মাঝে একটা দুষ্টু মিষ্টি ঝগড়া,এখন ভাবলে হাসির খোরাক
ভাবিনি আজ সেই ব্যাথা প্রকট হয়ে উঠবে ।
মাঝে বেশ কয়েকটা বছর -
অবশ্য যাতায়াতের পথ আর স্থানের পরিবর্তন ঘটলেও
ভোলা যায়নি সেই মুখ- ব্যাথা যেন মাঝে মাঝে ,
বুনো ঘাসের মতন চারা দিয়ে ওঠে ।
আড়ালে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি হেসে,
হাওয়া বৃষ্টির যুগলবন্দি যেন বলছে -
কি ভাবছিস -- আমরা আছি আর থাকবো ,
তুই কি তাকে পেলি ?

সলিল চৌধুরী ও সুধীন দাশগুপ্ত - সুরের দুই দিশারী

"গত শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ যেমনভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে ভাষা, শিল্পকলা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণ করেছে, ঠিক অনুরূপভাবেই ভারতীয় সঙ্গীতও পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে আত্মস্থ করেছে। প্রগতিশীল কৃষ্টি কখনোই বিদেশী প্রভাবের ভয়ে ভীত নয়। ... আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি বিশ্বের সঙ্গীত জগতে ভারতীয় সঙ্গীতের দেবার অনেক কিছুই আছে - কারণ ভারতীয় সঙ্গীতে আছে দুর্লভ গভীরতা, গাম্ভীর্য আর সর্বোপরি এর ভাবমাধুর্য। আজকের বিশ্বাসঙ্গীতে সমস্ত প্রয়োগ কৌশলের চমৎকারিত্বের আড়ালে রয়েছে ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন, ভারতীয় সঙ্গীত তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে - আত্মিক প্রতিফলন ঘটাবে।"

সলিল চৌধুরী

সংগীতিকা শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

হঠাৎ একটা ফরমায়েশ এলো সলিল চৌধুরী আর সুধীন দাশগুপ্ত র গানের structure আর arrangement নিয়ে কিছু লিখতে। আমি একটু দিশাহারা বোধ করলাম। প্রথমতঃ নিজেকে কোনোদিন ই গান বোদ্ধা বলে মনে করিনি - তার ওপর এই দুই দিকপালকে নিয়ে কিছু বলার যোগ্যতাও আমি অর্জন করেছি বলে মনে করিনা। তবে সব কথা ঠেলাও সম্ভব নয়। তাই যৎসামান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে কিছু বলার চেষ্টা করছি।

কাঠামো, প্রশ্নোত্তর আর সোজা পথের ধাঁধা

যদিও দুজনেই গানের structure নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন, আমার মতে সলিল অনেক বেশি দুঃসাহসিকতার নিদর্শন দিয়েছেন। দুজনেরই বেশির ভাগ গান স্থায়ী-অন্তরা - সঞ্চারী - আভোগ, এই ধাঁচে বাঁধা। সলিল প্রচুর ধাঁচ-বহির্ভূত কাজ করেছেন, মূলতঃ কবিতায় সুর বসিয়ে যে সব গান সৃষ্টি করেছেন তাতে এই কাঠামোর বালাই নেই। কাব্যের গতিতে, লেখনীর ছন্দে গান গাঁথা হয়েছে। সুধীনের খুব একটা এই জাতীয় কাজ খুঁজে পাইনা - প্রেমেন মিত্তিরের "সাগর থেকে ফেরা" আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের "ঠিকানা" র একটি অত্যন্ত অল্পশ্রুত সুরস্থাপনা ছাড়া। "বাঁশ বাগানের মাথার ওপর" গানটির উল্লেখ করা যায় কবিতার সুরারোপ হিসেবে, তবে কাঠামোগত ভাবে কিন্তু এটা খুবই সনাতনী, ওই স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ নিয়ে বানানো। তাই কবিতার ওই পুরোপুরি ওপেন structure টা নেই।

কিন্তু এদের বেশির ভাগ গানের মধ্যে পাশ্চাত্য সংগীতের একটা লুকোনো কিন্তু সর্বব্যাপী প্রভাব অনস্বীকার্য। এটা একটু খতিয়ে দেখতে গেলে কিছুটা সংগীতের পরিভাষার আশ্রয় নিতেই হয়। প্রচেষ্টা থাকবে খুব সহজ ভাষায় লেখার, পরিভাষার ব্যবহার শুধুমাত্র অনিবার্য কারনেই হবে।

পাশ্চাত্য সংগীতের structure এর ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে phrase এবং period। সাধারণত দুটো phrase দিয়ে একটা period তৈরী হয়। এই দুটো phrase কিন্তু এক নয়। কিছুটা প্রশ্নোত্তরের মতো। প্রথম, বা antecedent phrase যদি প্রশ্ন হয়, তার উত্তর বা resolution হয় consequent phrase এ। অর্থাৎ period এ সুরস্রষ্টা একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেন, সেটা পুরোপুরি সাঙ্গীতিক প্রশ্ন, যাতে শ্রোতার মনে একটা tension তৈরী হয়,তারপর খুব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সেই tension টাকে মিটিয়ে দেন।

একটা উদাহরণ দিলে কি বলতে চাইছি হয়তো একটু পরিষ্কার হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই মন কেমন করা গান , "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন " এই গানের প্রথম লাইনটা গেয়ে থেমে যান। কি, একটু অদ্ভুত লাগছে না? মনে হচ্ছে একটা কিছুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর একটু এগোলেই গন্তব্যস্থল - সম্মুখে শান্তি পারাবার। যখন "তোমার নিমন্ত্রণ" গাইলেন, কলজে ঠান্ডা হলো। কেন এরকম হয় ? এটাই period এর মজা। "থাকেনা কো মন" লাইনটাতে মন শব্দটির সুরের পিছনে খুব সূক্ষ্ম ভাবে *শুদ্ধ নি* আছে, যদিও গায়ক গাইছেন *রে* স্বর টি। *শুদ্ধ নি* কে পরিভাষায় "leading tone " বলা হয়, অর্থাৎ *সা* স্বরের পৌঁছনোর ঠিক আগের ধাপ। তা "leading tone " আর tonic note (অর্থাৎ *সা*) এর মধ্যে এক অমোঘ আকর্ষণ আছে। কোনো লাইন যদি "leading tone" এ শেষ হয়, অনিবার্য ভাবে সুরে tension সৃষ্টি হয়।

ঘুরে ফিরে "নিমন্ত্রণ" এ যখন আবার *সা*-এ ফিরে আসেন গায়ক, কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগে নিজেকে।

সুধীন আর সলিল ও মোটামুটি এই রসেই জারিত ছিলেন, আর তার প্রমান বেশির ভাগ গানেই আমরা পাই। সুধীন যদিও প্রচুর খাঁটি দেশজ সুরে গান রচনা করেছেন। তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে , সুধীন এর গানে একটা সুস্পষ্ট পাশ্চাত্য রঙের ছোঁয়া লাগে। হয়তো এটার পিছনে কিছুটা ছোট ভাই পরিমলের হাত আছে - দক্ষ গিটার বাদক হওয়ার দরুন গানে harmonic depth এর গুরুত্বটা সহজেই হয়তো বুঝেছিলেন পরিমল।

"আরো দূরে চলো যাই" গানটার কথাই ধরুন। আশার মধুমাখা কণ্ঠ যখন গেয়ে ওঠে "ঘুরে আসি", প্রথম phrase এর সেখানেই দাঁড়ি , আর আমরা শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে জানতে কোথায় ঘুরে আসার কথা বলছেন মাধবী। ওই "পাশা পাশি, ঘুরে আসি", শুনে অবচেতন মন বুঝতে পারে, যে সুর আবার ঘরে ফিরে এসেছে, আপাতত শান্তি। পাঠক বন্ধুদের কাছে আবেদন করি, বাংলা গান শোনার সময় একটু সচেতন থাকবেন এই ধরণের সুরের টানাপোড়েনের ব্যাপারে। অনেকে মনে করেন ওই ভাবে গান শুনলে রসগ্রহনে ব্যাঘাত ঘটে, বিশ্লেষণের মারপ্যাঁচ গানকে ঠিক ভাবে উপভোগ করতে দেয় না। আমি কিন্তু তা আদপেই মনে করি না। খুব সুস্বাদু খাবার চাখার সময় যেমন আমরা বোঝার চেষ্টা করি রান্নায় কি উপাদান দেওয়া হয়েছে, গান শোনার ব্যাপারটাও অনেকাংশেই সেরকম।

সলিলের গানেও আমরা এই রচনাশৈলী দেখতে পাই, তবে একটু বক্র ভাবে, কারণ উনি কোনোদিনই সোজা পথের ধাঁধায় পড়তে চাননি। এই দেখুন, কথা প্রসঙ্গে পেয়ে গেলাম উদাহরণ। "পথ হারাবো" "বলেই এবার", এই দুটি বাক্যাংশ কে দুটো phrase হিসেবে দেখা যেতে পারে। এবার দেখুন, এই দুটি phrase-এরই শুরুটা একরকম, কিন্তু ওই "এবার" শব্দটা শেষ হচ্ছে *শুদ্ধ নি* স্বরে। সলিল শ্রোতার মনে জাগিয়ে তুললেন *সা* তে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আর "পথে নেমেছি" র পাকদন্ডী দিয়ে ফিরে এলেন সেই *সা*-এ। এই গানের প্রথম লাইনটাকে সঠিক ভাবে প্যারালাল period বলা উচিত , কারণ দুটি phrase-এরই প্রারম্ভিক সুর এক। পারিভাষিক শব্দে এই tension resolution কে "ক্যাডেন্স" বলা হয়।

রানারের ইতিবৃত্ত

সুরের জাদু যেটা সলিল করতেন , তার গহনে লুকিয়ে আছে তাঁর পাশ্চাত্য harmonic তত্ত্বের অগাধ জ্ঞান। ওনার অনেক গানেই আমরা দেখতে পাই, মূল *সা* স্বর কে ভিত্তি করে *সা-গা-পা* সুর দিলেন কোন লাইনে , তার পরের লাইনেই *গা* কে *সা* ধরে আবার *সা-গা-পা* গড়লেন, যাতে শ্রোতার একটু বিভ্রান্তি ঘটে, আবার একই সঙ্গে সুরের এক অদ্ভুত নতুনত্বের স্বাদও বেরিয়ে আসে। "আজ তবে এইটুকু থাক" গানটির কথাই ভাবুন। "ধূসর ধুলির পথ" বেঁধেছেন এক *সা* এ, আবার "ভেঙে পড়ে আছে রথ" বেঁধেছেন আগের লাইনের *গা* কে *সা* ধরে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে।

অনেকগুলো গানে সলিল ক্রমাগত *সা* পাল্টেছেন,অর্থাৎ স্কেল পরিবর্তন করেছেন। এটাকে যদিও আমরা "tonic shifting " বলে থাকি , এর সঠিক নাম হলো modulation, এবং শ্রোতাকে সম্পূর্ণ দিশেহারা করার জন্য এটা যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ দুটো গানের নাম বলি : "শোনো কোনো একদিন" এবং "এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও" । রানার গানেও এই জাতীয় স্কেল নিয়ে খেলাধুলো আছে। রানারের এই বৃত্তাকার scaleবদল আমি একটা ছবির মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করেছিলাম:

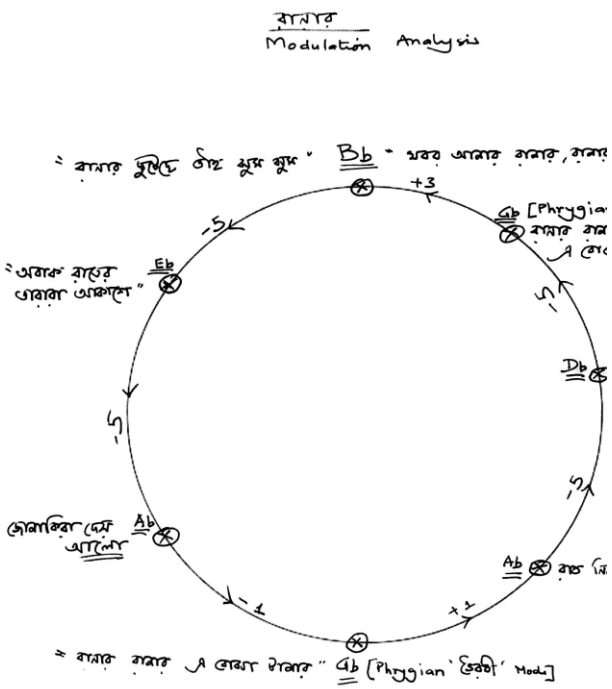

Arrangement, ছন্দ এবং আরো দু কথা

এবারে আসি “orchestration” বা যন্ত্রানুষঙ্গের বিষয়ে। একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, সলিল চৌধুরী র শৈশবের নেশা, বাঁশি, কিন্তু ওনার সমস্ত গানে ছড়িয়ে আছে। আর যেহেতু ছোটবেলা থেকেই গ্রামোফোনে western classical শুনে কান ঋদ্ধ , তারযন্ত্র আর choral এর ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঁশি আর string section এর harmonic মেলবন্ধনের এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ রয়েছে হিন্দি ছবি “সঙ্গত “ এর সেই গান “কানহা বোলে না” -এর শুরুতে। Strings এবং জলতরঙ্গ chordal প্রোগ্রেশন বাজাচ্ছে , আর তার ওপরে বাঁশি সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করছে। Choral অনুষঙ্গের জাদুকরী মাধুর্য্য গান কে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সলিল তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন। “পরখ” ছবির “মেরে মন কে দিয়ে” গানে শুধু লতা মঙ্গেশকরের “a capella “ (বাদ্যযন্ত্রহীন) গায়ন, মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ার ছোয়াঁর মতো choral অংশ ঢুকিয়েছেন সলিল, একটু হারমনিক depth আনার জন্য। গানটা শুনলে যদি গায়ে কাঁটা না দেয় তাহলে খুব আশ্চর্য হবো। আবার “এই রোকো” গানে রয়েছে পুরো পুরি jazz ভিত্তিক গিটার ও ড্রাম সঙ্গত।

এরকম অসংখ্য মনিমুক্তো ছড়িয়ে আছে সলিলের সাঙ্গীতিক ভাণ্ডারে।

সুধীনের গানে যদিও স্পষ্ট ভাবে chordal প্রোগ্রেশন দেখা যায় খুব প্রথমদিকের সৃষ্টি থেকেই, যেমন “এক ঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর”, তাহলেও সুধীন প্রবল ভাবে ভারতীয় ধাঁচে সুর দিতেন ষাটের দশকের মাঝামাঝি অবধি। “ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়” গানের অসহায়তা একতারার বিষন্ন আওয়াজে ধরা পড়ে , ঠিক যেমন একই ছবিতে “কাঁচের চুড়ির ছটা “ গানটি তবলা আর বাঁশি নিয়ে বৈঠকি মেজাজে আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। পিকনিক ছবি থেকে আমরা দেখি এক পুরোপুরি নতুন সুধীন কে। গানের চেহারাই পাল্টে ফেললেন। গিটার, ড্রাম আর বংগোর জমজমাট সঙ্গতে প্রতিটি গান ভরে দিলেন যৌবনের উচ্ছলতায়। আবার কিছু গানে fusion করে দেখালেন, রাগ সংগীত আর rock and roll অনবদ্য দক্ষতায় একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠলো, যেমন অনুপ ঘোষালের গাওয়া “চিন্তা নাই রে”, ছদ্মবেশী ছবির “বাঁচাও কে আছো মরেছি” অথবা বসন্ত বিলাপ ছবির “আগুন”। যে গানের হাত ধরে বাঙালির রকবাজি কৌলিন্য লাভ করলো, সেই “জীবনে কি পাবোনা” অবশ্য সুধীন আগাগোড়া rock’n’roll এর আদলে সৃষ্টি করলেন। সৌমিত্রর বেপরোয়া টুইস্ট নাচের পরিমণ্ডলে কোনো দেশী সুরের জায়গা ছিলোনা। আশা ভোঁসলের গলায় গাওয়া সুধীনের গান, সুধীবৃন্দ নিশ্চই স্বীকার করবেন, বাংলা গানের জগতে নজিরবিহীন।

একটু অন্য স্বাদের গান “আমি তার ঠিকানা রাখিনি”। সুধীন এই গানটি লিখে বদ্ধপরিকর ছিলেন যে কিশোর কুমার দিয়ে গাওয়াবেনই। কিন্তু সে সাধ তাঁর মেটেনি , মান্না দে এই গানটি তাঁর অসামান্য স্বরমাধুর্য ঢেলে গেয়েছিলেন। শ্রোতারা নিশ্চই লক্ষ্য

করেছেন, গানটার প্রথম স্তবকে একটা কি দুটো সুর কে বেশ খানিক্ষন টেনে রাখা হয়েছে - “রাখিনিইইইই .”, “আঁকিনিইইই.”, এটা কিছুটা পাশ্চাত্য সংগীতে বেহালার টানকে অনুকরণ করে বানানো। এই ধরণের স্বরপ্রয়োগের সময়ে দেখা যায়, western classical composerরা সুরটাকে অনেক্ষন ধরে রাখলেও, পিছনে chord পাল্টে দেন, যাতে শুনলে মনে হয় সুরের পশ্চাৎপট পাল্টে যাচ্ছে। ঠিক এই অঙ্গের আরো একটি গান আছে অজয় দাসের সুর করা ,”তোমাকেই ভেবে প্রহর ফুরায়”।

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পিছনে আমি দুজনের পরোক্ষ প্রভাব অনুমান করি। প্রথম জন সুধীনের সহোদর পরিমল, যাঁর কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় জন আরেক বঙ্গসন্তান , যিনি বোম্বেতে তুলকালাম কান্ড ঘটাচ্ছেন হিন্দি গানের ব্যাকরণ নিয়ে নয়ছয় করে। এবং এই পঞ্চমী প্রভাব যে সলিলকেও হেলিয়ে দেয়নি, সে কথা বলি কোন সাহসে ? ল্যাটিন rhythm নিয়ে গানের মাদকতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া তো প্রায় পঞ্চমের হস্তাক্ষর বলা যেতে পারে। আমি যদ্দুর জানি, Bossanova ছন্দের বাংলা গানে প্রথম আবির্ভাব হয় মান্না দের গাওয়া সুধীন সুরারোপিত “বন্ধু যদি তুমি নাই এলে” গানে, ১৯৭৫ সালের “অপরাজিতা” ছবিতে। তার দু বছর পরে সলিলও উষা মঙ্গেশকর কে দিয়ে গাওয়ালেন তাঁর bossanovaয় উদ্বেলিত গান “বলো কি করে বোঝাই “। একটা অপ্রীতিকর কথা একটু স্পর্ধাসহকারেই বলা যায় , যে সলিল ও সুধীন সুর এবং harmony নিয়ে যত যুগান্তকারী কাজই করে থাকুন, গানের ছন্দ নিয়ে কিন্তু সেরকম নাড়াচাড়া করেন নি। আর শুধু এই কারণেই রাহুল দেব বঙ্গহৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকতে পারবেন।

নটে গাছটি মুড়োল

অনেক বকবকানি হল। পাঠক বন্ধুরা যদি লেখাটা পড়ে এই দুই দিকপাল সুরস্রষ্টার গানের আঙ্গিক ও রসায়ন নিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করেন, তাহলে আমার কাজ সম্পন্ন মনে করবো। সলিলের একটা সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসাধারণ ইন্টারভিউ আছে Youtube এ, বেশ লম্বা, কিন্তু প্রচুর ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার খোঁজ পাওয়া যায় তার মধ্যে। সলিল খুব চাইতেন অর্কেস্ট্রাল woodwind section ব্যবহার করতে, নিদেনপক্ষে একটা oboe আর ক্লারিনেট থাকলে কি ভালো হতো ,প্রায়ই বলতেন। কিন্তু কলকাতায় চলে আসার পর এগুলোর কিছুই সহজলভ্য ছিল না, খুব আক্ষেপের সঙ্গে সে কথা বলেছেন। যাই হোক, এতো দৈন্যের মধ্যেও যে সম্পদ উনি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন করতে আরো অনেক সময় লেগে যাবে আমাদের। সুধীনও কিছুটা অবহেলিতই থেকে গেলেন “উঁচুদরের” সংগীত বোদ্ধাদের কাছে। প্রার্থনা করি এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা এই ছুৎমার্গ ছাড়িয়ে উঠে গান কে শুধু গানের মাপকাঠিতে বিচার করতে শিখবো।

That was summer

Shinjini Dutta Choudhury

Remember that time when you were sitting on the grass?

With your legs spread out,

and absentmindedly pulling out stalks?

Your mind was far away,

a fraction of the sun was visible above the horizon,

and you were thinking about how life was just great?

That was summer.

Remember that time when the sand was sifting through your toes?

Warm and rough,

calming you down?

The others were far away somewhere

and you were all alone.

But that was okay,

the solitude was peaceful sometimes.

You were either distraught or overjoyed,

ready to start bawling or to jump with delight,

That was summer.

Remember that time when the cool blue water was running up to your feet?

The sand was swirling around,

before settling down at the bottom.

The surface of the water was shimmering in the sunlight,

like a million gems glittering.

You were laughing and splashing,

just havin' a good ol' time.

Remember hanging out at the beach with all your friends and family?

That was summer.

Remember that time?

You were looking out the window,

watching the bright orange fireball sink just beyond the line,

the line where the ground met the sky,

and you were thinking, 'This is it, summer's nearly over...',

and you knew that winter would come,

bringing with it a different kind of fun.

And you were ready for it.

It was going to be fine.

Because summer would come again,

on another glorious day,

accompanied by a handful of sunshine and a sweet-smelling world,

and you would go to the beach,

or just be sitting on some fresh, green, grass,

mooching around,

just having a blast.

You knew that was it.

That Was Summer.

That's Where I'll Find You

By Shinjini Dutta Choudhury

Where the trees stand strong and tall
And the earth is hard and true
And there's solace in hearing the world around you breathe
That's where I'll find you

Sitting there in the moonlight
You don't think about much
You don't think about how late it is
Or what you ate for lunch
You imagine there is nothing left
No worries or concerns
And if you stay there long enough
You'll become a forest fern

A sort of ethereal feature of this Earth
A definite place where you'll fit
Moving with the wind
Softly fluttering as you flit
Can you hear the wind whisper to you?
With words no human understands
Can you feel it's tender caress?
It doesn't need a solid hand

Do you notice how the trees bend in welcoming?
As you settle down into the peace and quiet?
You are a dear old friend to them
Unlike those who take advantage of this wondrous place, you don't make a riot

You like to look up at the ancient stars
Sprinkled abundantly across a rich, deep-blue, sky
You wonder how there are so many
You see them every way you cast your eyes
Dappled, golden, sunlight, flies across your face
Still, silent, darkness, surrounding you
But it doesn't press in, pushing out all your deepest secrets
It moulds to you, sitting, eyes closed, in the midnight dew

That place makes you calm
It helps you understand
Why it embraces you
Just how beautiful this land
There is a certain magic there
That draws you in an alluring way
With its hush and tranquillity
It is where, for you, time simply slips away

And though you may be forgotten while you are there
You will never, ever, be able to fade away
As nature welcomes and cradles you, with it's own loving care
You are as sure as can be, that you feel the branches sway

Where, around you, a lush green barrier has been formed
And there are countless constellations for you to sing to
And you are shielded protectively by Mother Nature
That's where I'll find you.

মৃত্যুর সরণি দিয়ে অমৃতের আরাধনা

সঞ্জয় ব্যানার্জী

রবীন্দ্রনাথ জীবনে নানা পর্যায়ে বহু মৃত্যুর আঘাত পেয়েছেন, এ কথা সাধারণভাবে সকলেই জানেন। ৮০ বছরের জীবনে নিজের পরিবারে চল্লিশটির-ও বেশি মৃত্যু কাছ থেকে দেখতে হয়েছিল কবিকে। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা শাশ্বত সত্য, কিন্তু বহু প্রিয়জনের অকালমৃত্যুর যে নির্মম শোক কবিকে পেতে হয়েছিল এবং রুদ্ররূপী মৃত্যুদেবতার সেই নিরবচ্ছিন্ন বিধ্বংসী খেলা উপেক্ষা করে যেভাবে জীবনের পূর্ণতার গান গেয়ে গেছেন তা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। আমাদের নিভৃতলোকের চিরবন্ধু, সমস্ত আনন্দ-বেদনায় চিরসখা কবির জীবন মর্ত্যলোকে এক মহামানবের অলৌকিক আখ্যান অনুভব করলেও বিস্ময় কাটে না, অসংখ্য মৃত্যুশোকে দগ্ধ হয়েও কেমন করে বাইরে শান্ত ও অবিচল থেকে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন শেষ দিন পর্যন্ত ? এত আঘাতের পরও মৃত্যুঞ্জয়ী কবি কেমন করে বলতে পারেন-".. *যত বড়ো হও / তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও / আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে/ যাব আমি চলে* " ?

কবির জীবনপথে নিরবিচ্ছিন মৃত্যুর মিছিল থেকে জাগতিক নিক্তিতে সর্বাপেক্ষা নিদারুণ, মর্মান্তিক কিছু শোকের কথা উল্লেখ হল এই লেখায়। বলে রাখা প্রয়োজন যে স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মামাফিক মৃত্যুর ঘটনা, যথা পরিণত বয়সে পিতার মৃত্যু অথবা কবির ৬৫ বছর বয়সে, তাঁর থেকে ২১ বছরের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ (বড়বাবু) -এর মৃত্যু, ইত্যাদি-র কথা এখানে হচ্ছে না – পরিবারের অতি কাছের কিছু প্রিয়জনের অকাল মৃত্যুর নির্মম আঘাতের অভিঘাতের কথাই শুধুমাত্র উল্লেখ রইল এই তর্পনে।

কবির জীবনে মরণের প্রথম আবির্ভাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধেন্দ্রনাথ-এর (দেবেন্দ্রনাথ এবং সারদা দেবী-র সর্বশেষ সন্তান) শৈশবে মৃত্যু – যদিও ৩ বছর বয়সে তা রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় স্মৃতির পূর্বের ঘটনা। অকালমৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতের সাথে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে মা সারদাসুন্দরী দেবীর প্রয়ানের সময়। কবির বৌদি প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সারদা দেবীর হাতের উপর লোহার সিন্দুকের ডালা পড়ায় আহত আঙ্গুল পরে বিষিয়ে যায় এবং প্রায় এক বছর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকার পর এর থেকেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে সারাদাদেবীর বয়স হয়েছিল ৪৫, বালক রবীন্দ্রনাথ-এর তখনো ১৪ বছর পূর্ণ হতে কয়েক মাস বাকি।

সারদা দেবী (১৮৩০-১৮৭৫)

এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, "মার যখন মৃত্যু হয়, আমার বয়স তখন অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই! ⋯ যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কি সর্বনাশ হল রে!' ⋯ তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না! প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না! বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান!..

কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। ... কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না !... "

অকস্মাৎ, অকালমৃত্যুর দীর্ঘ অভিশপ্ত ছায়া, যা ঘন ঘন নেমেছে ঠাকুরবাড়িতে এবং কবির জীবনপথকে শেষ দিন অব্দি আছন্ন করে ছিল, তার অন্যতম উদাহরণ কবির বিবাহের রাতে (৯-ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) বড় ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর আকস্মিক প্রয়াণ। কবির থেকে চোদ্দ বছরের বড়, সর্বজেষ্ঠ দিদি সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় জামাতা এবং ভরসার পাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ-এর সাথে মিলে ইনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার অন্যতম প্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠান জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। শিলাইদহে জমিদারীর তদারকি করতে গিয়ে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সারদাপ্রসাদ-এর মৃত্যু ঘটে। পরের দিন যখন মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, শোকের ছায়ায় আনন্দের পরিবেশ মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় এবং বাসি বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। তরুণ কবির মনে এই অকালমৃত্যু এবং মাতৃসমা সহোদরা-র দুর্ভাগ্য, যাঁর স্নেহ সারদা দেবীর প্রয়াণের পর বালক কবিকে সর্বদা ঘিরে রাখত, গভীর আঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

কবির ২৪ বছর বয়সে, মার মৃত্যুর দশ বছর পর এবং বিয়ের ৪ মাস ১০ দিনের মাথায় — নতুন বৌঠান কাদম্বরী কোন এক অজানা অভিমানে আত্মঘাতী হন। বহুল চর্চিত এই দুর্ঘটনা, অনেক গবেষকের মতে, 'রবীন্দ্র জীবনের তীব্রতম, মহত্তম দুঃখ'।

দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কাদম্বরী দেবীর বিয়ে হয় ১৮৬৮ সালে — কাদম্বরীর বয়স তখন ৯, রবীন্দ্রনাথের ৭। বাল্য, কৈশোরের সবচেয়ে কাছের, হাসিখেলার সাথী, প্রাণের ছোঁওয়ায় যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভুবন জুড়ে — তাঁর অকালমৃত্যু কবির মনে গভীর শোকের ছায়া রেখে যায় এবং আমৃত্যু সে বেদনা তিনি বহন করেছিলেন। বহু যুগ পরেও, পরিণত বয়সে কবির নানা রচনায়, চিঠিপত্রে, প্রৌঢ় জীবনের শিল্পকর্মের মধ্যে বারবার পরোক্ষভাবে এসেছে বাল্যসখার প্রতি তাঁর অমলিন ভালবাসার নিদর্শন।
উদাহরণস্বরূপ,উদ্ধৃত করা যেতে পারে কাদম্বরীর মৃত্যুর ৩০ বছরেরও পরে রচিত এই দুটি কবিতার অংশবিশেষ:

কাদম্বরী দেবী (১৮৫৮-১৮৮৪)

শ্যামা (কাব্যগ্রন্থ - আকাশপ্রদীপ)

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

প্রথম শোক (কাব্যগ্রন্থ - লিপিকা)

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।
সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'আমাকে চিনতে পার না?'
আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, 'মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।'

সে বললে, 'আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'
তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, 'সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।'

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।'
সে বললে, 'এই দেখো-না আমার গলার হার।'
দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।
আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।'
সে বলে, 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।'

কাদম্বরীর শোচনীয় মৃত্যুর মাত্র ৩ মাসের মধ্যে, ঠাকুরবাড়িতে নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাত আবার নেমে আসে পরিবারের এক মুখ্য প্রতিনিধির অকালপ্রয়ানে। ১৮৮৪ সালের জুন মাসে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান দেবেন্দ্রনাথ-সারদার তৃতীয় পুত্র, রবীন্দ্রনাথের থেকে সতেরো বছরের বড় সেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথের পরের ভাই), হেমেন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির ডাকাবুকো সদস্য হেমেন্দ্রনাথ শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চা এবং জাপানী মার্শাল আর্ট-এর পৃষ্টপোষক ছিলেন। বিজ্ঞানমনস্ক, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় পন্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ এই মানুষটি পরিবারের সকলের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভাই-বোন, মায় বাড়ির বউদের কাছে তিনি ছিলেন কড়া গৃহশিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীর সেই দলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ, স্বর্ণকুমারী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী, নিজের স্ত্রী নীপময়ী প্রভৃতি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'পুরাতনী' গ্রন্থে স্মৃতিচারনা করেছেন, 'বিয়ের পর আমার সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন৷ তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল৷ আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম৷' এমন প্রাণবন্ত, সুসাস্থ্যের অধিকারী মানুষটি মাত্র চল্লিশেই কেন চলে গেলেন, তা নিয়ে মতান্তর আছে। জ্ঞানদানন্দিনী লিখছেন, "সেজঠাকুরপোই বেশি কুস্তি করতেন৷ বোধহয় কুস্তি ছেড়ে দেবার পর যে বাতে ধরল তাতেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি মারা গেলেন৷"

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৮৮৪)

সাধারণের অধিক অবহিত বিপুল আঘাতের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম জানা বহু মৃত্যুর বিধ্বংসী মিছিল চলেছিল পরিবারে নিরন্তর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাইপো –ভাইঝি মহলে অত্যন্ত প্রিয় খুড়ো মশায়। কবির পরম স্নেহের, সন্তানসম বেশ কয়েকজন ভাইপো, ভাইঝির অকালমৃত্যু তাঁকে দেখতে হয়েছিল নিজের জীবদ্দশায়।

কবি এবং কবিপত্নী মৃণালিনীর অত্যন্ত স্নেহধন্য ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র সন্তান। সুদর্শন, প্রতিভাবান এই তরুণ অল্প বয়সেই সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তির নিদর্শন রেখেছিলেন এবং তাঁর স্বল্প জীবনের সাহিত্যচর্চা, ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিষয়ে নানা চিন্তা-ভাবনা এক অসম্পূর্ণ মহৎ সম্ভাবনার পরিচয় দেয়। ১৮৯৯ সালের অগস্ট মাসে, ২৯ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু হয় ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পরের প্রজন্মের এই উজ্জ্বল মানুষটির। বলেন্দ্রনাথ-এর মৃত্যু আরো বেদনাদায়ক কারণ তা শুধুমাত্র নিয়তির লিখন ছিল না – সে যুগে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক হিংসার এক ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'On the Edges of Time' স্মরনিকায় লিখেছেন - "Cousin Balendra was also a favourite of Father's. Observing his artistic and literary tendencies, Father took him under his care and started to train him from an early age ..... I remember how Baludada would bring his essays which he had been enjoined to write and wait for Father's verdict on them. ..... In his essays not a single sentence is redundant – not a single word can be replaced by a happier substitute. Baludada died young – one of the first victims in Bengal of Hindu-Moslem communal tension- while trying to defend his mother when the carriage in which they were driving was attacked. His death was due to the after-effects of a wound he received in the head. He left only one or two books of poems and a volume of prose, but they have a distinctive place in Bengali literature."

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)

কবির আদরের ভাইঝি অভিজ্ঞা দেবী, ডাকনাম অভি, ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ-এর ষষ্ঠ সন্তান এবং তৃতীয়া কন্যা। তখনকার দিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল ডাক্তার দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের অনুষ্টানের শেষ দিকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পরেন হঠাৎ আসা প্রবল জ্বরে, যা কয়েকদিনের মধ্যেই দুরারোগ্য যক্ষ্মার আকার নেয় এবং বিয়ের এক মাসের মধ্যে মাত্র ২২ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এই মারণ রোগটি ঠাকুরবাড়িতে অসংখ্য বার হানা দেয় এবং রবীন্দ্রনাথ-এর জীবনে যক্ষ্মার রূপ ধরে মৃত্যুদূতের নিষ্ঠুর নির্মমতা কখনো থামেনি।

অভির অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং বহুকাল পরেও তাঁর কথায় মাঝে মাঝে সেই বেদনা বেজেছে, যেমন প্রায় ৩০ বছর পরের এই লেখায়- "একদিন কি একটা কারণে, আমার খুব রাগ হয়েছিল৷ অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, ঠিক সেই সময়ে যা তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। তারই মুখে রূপকথার গল্প শুনে আমি সোনার তরীতে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলাম৷"

অভিজ্ঞা দেবীর স্বল্পজীবনে তাঁকে যারা দেখেছেন, তাঁদের স্মৃতিতে ধরা পড়েছে এক শান্ত, গভীর, কোমল ব্যক্তিত্বময় চরিত্র এবং সকলেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর মাধুর্য পূর্ণ দুটি বড় বড় জীবন্ত চোখের কথা। অভিজ্ঞা দেবীর অসাধারণ গানের গলা ছিল, এবং তাঁর কণ্ঠে কাকার প্রথম জীবনের গানগুলি জীবন্ত রূপ ধারণ করত, যা শুনে মুগ্ধ হতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর-এ ঠাকুরবাড়ির তিনতলার ছাদে পাল খাটিয়ে, স্টেজ বেঁধে প্রথম অভিনীত হয় কালমৃগয়া, যাতে দশরথ ও অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কলকাতার যে বিদ্দজনেরা সেদিন নাটকের দর্শক ছিলেন, তাঁদের সবথেকে মন কেড়েছিল লীলার ভূমিকায় ৯ বছরের বালিকা অভিজ্ঞার অভিনয় ও গান। এরপর কবি যখন বাল্মীকি প্রতিভা এবং মায়ার খেলা রচনা করেন, অভিজ্ঞার অভিনয় ও কণ্ঠে তার প্রতিটি গানে কাহিনী যেন প্রাণ প্রতিষ্টা পেয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথা 'ঘরোয়া' গ্রন্থে অনেক পরে লিখেছিলেন – " .... কিন্তু হায়, যে ও-সব গান গাইবে সে মরে গেছে৷ সেই পাখির মতো আমাদের ছোটো বোনটি চলে গেছে৷ এখনো 'মায়ার খেলা'র গান যদি কাউকে গাইতে শুনি, তার গলা ছাপিয়ে কতদূর থেকে আমাদের সেই বোনটির গান যেন শুনি৷ সে-সুরে যে পাখি গাইত সে পাখি মরে গেছে৷ কে গাইবে৷ অভির গলায় ঐ সুর যা বসেছিল! তার গলার timbre অদ্ভুত ছিল৷..." | প্রায় এক প্রতিধ্বনি শোনা যায় রথীন্দ্রনাথ-এর স্মৃতিচারণে – "...There was no lack of good voices, but the one which my father specially cared to hear was my cousin Abhi's. She sang with the abandon and spontaneity of a bird intoxicated by the warmth of spring. She died very young and her sweet ringing voice never brought cheer to the house any more. "

অভিজ্ঞা দেবী (১৮৭৪-১৮৯৬)

আরেক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ছিলেন বয়সে রবীন্দ্রনাথ-এর চেয়ে বছর সাতেকের ছোট৷ তাঁর নানা গুনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গৃহসজ্জায় শিল্প ভাবনা। শিলাইদহে পুরোনো নীলকুঠি ভেঙ্গে নতুন 'লালবাড়ি'-র নির্মান, ঠাকুরবাড়িতে নাটকের মঞ্চনির্মানের ভার - এ সব কিছুর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান-এর দায়িত্ব থাকত নীতিন্দ্রনাথের ওপর। রবীন্দ্রনাথ-এর অত্যন্ত অনুগত এবং মৃণালিনী দেবীর বিশেষ প্রিয়পাত্র নীতিন্দ্রনাথ লিভার-এর দূরারোগ্য অসুখে প্রায় বৎসরকাল আক্রান্ত থাকার পর ১৯০১ সালে ১৩-ই সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯০১)

কবি কন্যা মীরা দেবী 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে বলেছেন – "... আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ও নীতিন্দ্রনাথ-কে মা সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। নীতুদাও নিজের ভাইদের চেয়ে আমাদের ভাইবোনদের বেশি ভালবাসতেন ও আমাদের কাছেই বেশি থাকতেন। মা-বাবার কথা মনে করে নীতুদা প্রাণপণ যত্নে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে 'লালবাড়ি' (এখনকার বিচিত্রা) তৈরি করিয়েছিলেন। .... দুঃখের বিষয় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে নীতুদার শরীর ভেঙ্গে গেল এবং লালবাড়ি শেষ হওয়ার কিছুকালের মধ্যে ঐ বাড়ির একটি ঘরে শয্যা নিলেন ও বোধ হয় ঐ বাড়িতেই মারা যান। নীতুদার মৃত্যুতে মা খুব কাতর হয়ে পড়েন।"

রবীন্দ্রনাথের সাথে কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে মৃণালিনী দেবী মাত্র ২৯ বছর বয়সে, কয়েক মাসের রোগভোগের পর মারা যান। মৃত্যুর সময় মৃণালিনী দেবী রেখে যান তিন মেয়ে ও দুই ছেলে — কবির বয়স তখন ৪১।

খুলনার ফুলতলি গ্রামের পল্লীবালিকা ৯ বছরের ভবতারিণীর (মৃণালিনীর প্রাক-বৈবাহিক নাম) সাথে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের ধনবান, রুপবান, খ্যাতিমান ২২ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ-এর বিবাহ যে এক নেহাৎই অসম ঘটনা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ভবতারিণীর মৃণালিনী হয়ে ওঠা, শুধু নামের বহিরঙ্গে নয়, কবির যথার্থ সহধর্মিণী ও সহকর্মিনী হয়ে জীবনযজ্ঞে যোগদান এবং তাঁদের স্বল্পকালীন দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য-র মূল্যায়ন 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হয়েই থেকে গেছে।

মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২)

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার উষ্ণ ছটার মাঝে মৃণালিনী দেবীর চরিত্রে ছিল শান্ত নদীটির সজল, শীতল আলিঙ্গন ও নির্ভরতা। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, "কাকিমা দেখতে ভালো ছিলেন না, কিন্তু খুব মিশুকে ও পরকে আপন করবার ক্ষমতা ছিল ..."। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, "Being of a sweet and affectionate nature, my mother was liked by all the members of the family. They came to her and she shared in their happiness. They would also come to her when they were in any difficulty, and she shared their sorrows too. She bestowed her affection equally on everybody ...."

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দাম্পত্যজীবন প্রকৃত বিকাশ পায় বিবাহের চার বছর পর, শিশুকন্যা বেলা-কে নিয়ে জোড়াসাঁকোর অভিজাত পরিবেশের বাইরে, গাজিপুরে নিভৃত নিবাসে বাসের সময়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখছেন- "স্বামীকে আপনার সংসারে, নিজের মত করিয়া, কেবল নিজের করিয়া পাবার আকাঙ্খা নারীর পক্ষ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা পত্নী মৃণালিনী দেবীর সারাজীবনে এই প্রথম ঘটিল: রবীন্দ্রনাথ যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে স্ত্রীকে পাইলেন সঙ্গিনীরূপে, প্রেয়সীরূপে – 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।'" এরপর শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এবং শান্তিনিকেতনে অতিথিভবনে বাসকালে সে সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে।

মৃণালিনী দেবীর অভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ পত্নীকে বেশ সমীহ করে চলতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্ধু প্রিয়নাথকে একটি চিঠি শেষ করছেন এইভাবে – "বেলা অনেক হল। এখন নাইতে খেতে যাওয়া যাক। নইলে নির্দোষী নিরপরাধ তুমি সুদ্ধ গৃহিনীর বিদ্বেষের ভাগী হবে। ..." সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সহকর্মিনী হয়েছেন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্টার সময়। বিদ্যালয়ের কাজে যখনই অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে, নিজের গায়ের গয়না বিক্রি করে রবীন্দ্রনাথকে টাকা এনে দিয়েছেন মৃণালিনী। পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এইভাবে শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল।" আশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্রদের তত্ত্বাবধান, খাওয়া দাওয়ার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন মৃণালিনী। ঊর্মিলা দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহোদরা) তাঁর 'কবিপ্রিয়া' প্রবন্ধে লিখছেন-" ছেলেরা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেত, মাতৃস্নেহ পেত, রোগে সেবাযত্ন পেত, আর সুখেদুঃখে সহানুভূতি পেত।"

সম্ভবতঃ বিদ্যালয় স্থাপনের পর এমন কঠোর পরিশ্রমের জন্যেই কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর শরীর পড়ল ভেঙ্গে, ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনা হল চিকিৎসার জন্য – সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের সেবা। হেমলতা দেবী (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী) লিখেছেন, "মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন, তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে। প্রায় দু মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, ভাড়া করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি একদিনের জন্যও দেন নাই।" তখনও electric fan –এর প্রবর্ত্তন হয়নি — অসুস্হ স্ত্রীর বিছানার পাশে সারারাত জেগে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন কবি। তবু সব চিকিৎসা, সব সেবার বাঁধন কাটিয়ে ১৯০২ সালের ২৩শে নভেম্বর মৃণালিনী চলে গেলেন। থেমে গেল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় মিষ্টি সম্বোধনের পত্রধারা – 'ভাই ছুটি'।

কবির তৃতীয় সন্তান এবং দ্বিতীয় কন্যা রেনুকা, ডাক নাম রানী, ছোট থেকেই একটু স্বতন্ত্র। ঊর্মিলা দেবী লিখছেন - "রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! ... শিশুকাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না ... মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচন্ড। বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন।" পরের বোন মীরাদেবী লিখছেন – "রানীদিকে বেশির ভাগ সময় বই পড়তে দেখতুম। গল্পগুজব খুব কমই করতেন।"

কোনো অজানা কারণে মাত্র এগারো বছর বয়সে রানীর বাল্যবিবাহ দেন রবীন্দ্রনাথ, বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের মাত্র এক মাসের মাথায়। লন্ডনে অবস্থানরত বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে কবি চিঠিতে জানাচ্ছেন, '...হঠাৎ আমার মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব - আমি বলিলাম, করো। যেদিন কথা তাহার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল।" রানীর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ বিয়ের মাত্র দু'দিন পরেই চলে গিয়েছেন আমেরিকায়, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা নিতে। এদিকে কবিজায়া মৃণালিনী স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তখন তিনি জেদ করে জামাই সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং রানীর ফুলশয্যা উৎসব সম্পন্ন করান।

রানী (১৮৯১ - ১৯০৩)

আগেই বলা হয়েছে মৃণালিনী দেবী চলে যান ১৯০২-এর নভেম্বরে। এর কিছুদিন পরেই সদ্য মাতৃহারা রানী আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মায়। প্রানাধিক কন্যার অসুস্থতা কবিকে প্রবল বিচলিত করেছিল, মেয়ের সমস্ত সেবা-শুশ্রুষার ভার তুলে নেন নিজের হাতে। রোগের প্রথম দিকে, শান্তিনিকেতনে বাড়ির বারান্দায় বসে অসুস্থ মেয়েকে উপনিষদ-এর বাণী শোনাচ্ছেন কবি, মীরা দেবীর স্মৃতিচারণে এ দৃশ্য ধরা রয়েছে। হয়ত এভাবেই ধীরে ধীরে মেয়ের মন তৈরী করে দিতে চেয়েছিলেন পিতা। স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় মেয়েকে নিয়ে প্রথমে হাজারিবাগ ও পরে আলমোড়ায় যান রবীন্দ্রনাথ। আলমোড়া থেকে কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরে রানী। কলকাতায় ফেরার এক মাসের মধ্যে শেষ লগ্নটি যখন আসে, তখন একাধারে পিতা এবং গুরুর হাত ধরে রানী বলেছিল, "বাবা, 'পিতা নোহসি' শোনাও" — পিতা, তুমি আছ, এই মন্ত্র কানে নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে রানী সংসারের দুয়ার পেরিয়ে যাত্রা করে অমৃতধামের উদ্দেশে। স্ত্রী-র মৃত্যুর ন'মাসের মাথায়. কবি হারালেন মধ্যম কন্যাকে।

কবির পঞ্চম এবং সর্বশেষ সন্তানের জন্ম হয় ১৮৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ-এর চেহারা আর স্বভাবের মধ্যে নিজের শৈশবকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কৌতুক ছলে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে 'শমী ঠাকুর' বলে অভিহিত করতেন। মাত্র ছ'বছর বয়সে শমী মাতৃহারা হন এবং মায়ের মৃত্যুর ন'মাস পরেই প্রত্যক্ষ করেন মেজদিদির অকাল মৃত্যু। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন শমীন্দ্রনাথ। গেরুয়া বসনে ছোট শমীকে লাগতো প্রাচীন মুনি ঋষিদের অনুগত শিষ্যের মত। তাঁর সরল শান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, নম্র আচরণ সকলকে আকৃষ্ট করত। কেউ তাঁকে কখনো বিমর্ষ দেখেনি। "আমার ছোট ছেলে শমী লোকজন এলে তাদের মোট ঘাড়ে করে আনত" - বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬ – ১৯০৭)

১৯০৭ সালের পূজার ছুটি। বিজয়া দশমীর দিন শমীন্দ্রনাথ বন্ধু ভোলার সঙ্গে তাঁর মামার বাড়ি মুঙ্গের যাত্রা করেন। ছুটি শেষে বিদ্যালয় খোলার মুখে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসংবাদ পৌঁছল শমীর কলেরা হয়েছে। তক্ষুণি তিনি ডাক্তার সহ ছুটলেন মুঙ্গের। সকলের প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে ২৪ নভেম্বর, ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর ৯ মাস বয়সে শমী শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাঙলা তারিখ ৭-ই অগ্রহায়ণ — মা মৃণালিনী দেবীর চলে গিয়েছিলেন ঐ একই দিনে ঠিক পাঁচ বছর আগে।

পুত্রশোকাতুর রবীন্দ্রনাথ রাত্রে ট্রেনে আসতে আসতে দেখলেন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। তাঁর মন বললে, "... কম পড়েনি - সমস্তের মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে।

পঁচিশ বছর বয়সে কবি প্রথম বাবা হন। প্রথম সন্তান মাধুরীলতা — কবির প্রিয় বেলফুলের নামে জ্যেঠিমা জ্ঞানদানন্দিনী নাম রাখেন বেলা। বাবা আদর করে ডাকেন বেলি, বেলু বা বেলুবুড়ি বলে। বেলা-র প্রতি কবির একটু বেশিই ভালবাসা ছিল, যেটা তাঁর দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমরা সেটা খুবই জানতুম। কিন্তু তার জন্যে কোনোদিন ঈর্ষা বোধ করিনি, কেননা আমরাও সকলে দিদিকে অত্যন্ত ভালো বাসতুম এবং মানতুম। দিদির বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তা মানতে আমাদের লজ্জাবোধ হতো না। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সেই জন্য বাড়ির সকলের কাছ থেকে প্রচুর আদর পেতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন।"

পিতার মতো মাধুরীলতাও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা অনুসরণ করেন নি। কিন্তু বাড়িতেই বহুবিধ বিদ্যার চর্চা করেছেন তিনি। ইংরেজি ও সংস্কৃত শিখেছেন মিস্ পার্সন্স, মিস্ এলজি, মিস্ লিটেন, মিঃ লরেন্স, শিবধন বিদ্যার্ণব ও পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। মহাভারত, উপনিষদ ও মনুসংহিতার কিছু শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন মাধুরীলতা। তাঁর বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার দিনে বিশিষ্ট পত্রিকায়। প্রশান্ত মহলানবীশকে একটি চিঠিতে মাধুরীলতার রচনাশক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -"ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না।"

শৈশবে বাবার কোলে বেলা এবং যৌবনে মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮)

বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে পরবর্তী কালে তাঁর লেখনী সোচ্চার হলেও, কবি নিজের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন অপরিণত বয়সেই। মাধুরীলতার বিবাহ হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে - কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎকুমার চক্রবর্তী-র সাথে। জামাই-এর তখন বয়স ৩০, বেলার চেয়ে ১৬ বছরের, শাশুড়ি মৃণালিনীর থেকেও ৪ বছরের বড়। এই জামাই-এর কাছে নানা অসম্মান, অপমান কবিকে সহ্য করতে হয়েছিল সারাজীবন। মাধুরীলতার একটি সন্তানের অজাতমৃত্যু ঘটেছিল এবং আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের আর কোনো সন্তান হয়নি।

১৯১৭ সালের জুন মাসে অসুস্থ হন মাধুরীলতা। প্রথমে ঘুসঘুসে জ্বর - পরে রানীর মতোই যক্ষ্মায় আক্রান্ত এবং শয্যাশায়ী হলেন মাধুরীলতা। শরৎ ও মাধুরী তখন কলকাতার কাছে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে আসেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিদিনই মেয়েকে দেখতে যেতেন, দিনের বেলাটা কাটাতেন মেয়ের সঙ্গে এবং জামাই হাইকোর্ট থেকে ফেরার আগে চলে আসতেন জোড়াসাঁকোয়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ".. my sister Bela, who was staying with her husband in Calcutta, fell ill. ... From the time she fell ill and until her death Father was constantly by her bedside attending her as no nurse could possibly do and trying his best to keep her cheerful."

সীতা দেবী (কবিবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা) 'পূন্যস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন, " ... [১৬ মে ১৯১৮] রাত্রে খবর পাইলাম, সকালে বেলাদেবী মারা গিয়াছেন। বাবা জোড়াসাঁকো গিয়াছিলেন, সেখানে এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া আসিলেন। মন দারুণ পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। জোড়াসাঁকোয় গিয়া বাড়ির সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইতেই দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ দোতলায় বসিয়া আছেন। কাছেই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ বসিয়া। প্রণাম করাতে, অন্যদিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, 'বোসো'।' মুখের চেহারা অতি বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেকদিন রোগভোগ করিয়া উঠিয়াছেন। ... রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া এই নিদারুণ সংবাদ পান। বাড়ি আসিয়া দুপুর ২-টা পর্যন্ত তেতলার ছাদে ছিলেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিবার সাহস করে নাই। 'অনেকদিন থেকেই জানি ও চলে যাবে। তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখান ধরে বসে থাকতুম। ছেলবেলার মতো বলতো, বাবা গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হল।' এই বলে চুপ করে বসে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্ত সমাহত।"

মাধুরীলতা ফুল ভালবাসতেন। বেল ফুলে ঢেকে মোটরকারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে। প্রতিমাদেবী বলেছিলেন, "... সে দিন যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল বেলাকে।"

কবির জীবদ্দশায় পুত্র কন্যার মধ্যে বেঁচে ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং চতুর্থ সন্তান, কন্যা মীরাদেবী। মৃত্যু দেখতে না হলেও মীরাদেবীর জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্যও কবিকে চরম ব্যথা পেতে হয়েছিল। কবি ছোট মেয়েরও বাল্যবয়সে বিবাহ দেন, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে। কবির জামাতা ভাগ্য ভয়ঙ্কর রূপে খারাপ। নগেন্দ্রনাথকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য। সেখান থেকে ফিরে আসার পর নগেনের দুর্ব্যবহার সীমাহীন হয়ে ওঠে। কবি লক্ষ করছেন,

নীতিন্দ্রনাথ (১৯১২ – ১৯৩২)

নগেনের 'দুর্দ্দাম বর্ব্বরতা'-য় আতঙ্কগ্রস্ত মীরা পারছে না তার স্বামীকে ভালবাসতে। বাবা হিশেবে রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, তাঁর চাপিয়ে দেওয়া সম্পর্কের জেরে ছারখার হয়ে গেল তাঁর মেয়ের জীবন। এমনই এক শোকাতুর উপলব্ধির মধ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে অসহায় পিতা লিখছেন - ''বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল তখন একটা গোখরো সাপ ফস করে ফনা ধরে উঠেছিল— আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনই ওকে কাটত তাহলে ও পরিত্রাণ পেত।''

১৯২০ সালে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পর মীরাদেবী কন্যা নন্দিতা (বুড়ি) এবং পুত্র নিতিন্দ্রনাথ (নিতু)-কে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে আসেন। নাতিকে কবি জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেন Printing Technology-তে উচ্চশিক্ষার্থে। সেখানেই ছাত্রাবস্থায় নিতু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। স্নেহাতুর দাদামশায় নাতির অসুস্থতার খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পরেন এবং প্রিয় বন্ধু চার্লস এন্ড্রুজ, যিনি তখন ইউরোপ-এ ছিলেন, অবিলম্বে নিতুর কাছে চলে যেতে নির্দেশ দেন। কয়েকদিন পর মীরা দেবীও পৌঁছন জার্মানীতে।

কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মাত্র ২০ বছর বয়সে নিতেন্দ্রনাথ চলে যান - দিনটি ছিল ১৯৩২ সালে ৭-ই অগাস্ট (৯ বছর পর এই দিনেই কবিও শান্তি পারাবারে চলে যাবেন)। সকালে নিতুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে রয়টার থেকে টেলিগ্রাম যখন এসে পৌঁছয় কলকাতায়, কবি তখন ছিলেন প্রশান্ত ও রানী মহালনবিশের বরানগরের বাড়িতে। শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকলেন বৃদ্ধ কবি (তখন ওনার বয়স ৭১), দু ফোঁটা জল বুঝি গড়িয়ে পড়ল চোখের। ওই একবারই শোক ক্ষণিকের জন্য সর্বসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়লেও তিনি আবার দ্রুত ঢুকে পড়েছিলেন লোকচক্ষুর অজ্ঞাত তাঁর নিভৃত মানসলোকে। রানী মহলানবিশ লিখছেন, "দুপুরে যখন খাবার দিতে গেলাম, দেখি একেবারে সহজ মানুষ। মুখের ভাবে কথায় বার্তায় কোনো পরিবর্তন বোঝা যায় না। অথচ আমরা সকলেই জানি নিতু ওঁর কতখানি ছিল।"

কন্যা মীরাদেবী-কে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছেন কবি – " ... যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নিতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে কল্যাণ হোক।"

এই-ই সব নয়। পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর সরণিতে শেষযাত্রা, নিঠুরের নির্দয় ধ্বংসলীলা দেখতে বাধ্য হয়েছেন কবি সারা জীবন। কোনো অসীম দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতায় এর কিছু নিগূঢ় অর্থ আছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু নশ্বর শরীরে যে মানুষটি একদিন এসেছিলেন এই মর্ত্যভুমে এবং চিরদিন থেকে গেলেন আমাদের জীবনে, চেতনায়, সুখ, দুঃখ, সব অনুভূতি-র শেষ নির্জন আশ্রয় হয়ে — সেই মহাজীবনের এমন সকরুণ বেদনায় মুচড়ে ওঠে আমাদের মন। দৌহিত্র নিতেন্দ্রনাথ-এর মৃত্যুর দিনে কবির রচিত এই কবিতাটির মত আমাদের মনেও হাহাকার রবে বেজে ওঠে একই প্রশ্ন – কেন, কেন এত বেদনা .... ?

[দুর্ভাগিনী : বীথিকা – রচনা (আনুমানিক) ৭ অগস্ট, ১৯৩২]

তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন--
কেন, ওগো কেন!

স্বজনহারা রবি[1]		
১৮৭৫	সারদাসুন্দরী দেবী,	মা
১৮৮১	গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৮৮৩	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	ভগ্নীপতি
১৮৮৪	কাদম্বরী দেবী	বৌদি
১৮৮৪	হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সেজদাদা
১৮৯৪	বিহারীলাল চক্রবর্তী	আদর্শ কবি, মৃত্যুর পরে বেয়াই
১৮৯৫	অভিজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়	ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৭	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভগ্নীপতি
১৮৯৯	উষাবতী চট্টোপাধ্যায়	ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৯	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯০১	নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯০২	মৃণালিনী দেবী	স্ত্রী
১৯০৩	রেণুকা ভট্টাচার্য	মধ্যম কন্যা
১৯০৩	বিমানেন্দ্রনাথ রায়	মামাতো ভাই
১৯০৫	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাবা
১৯০৭	শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কনিষ্ঠ পুত্র
১৯০৮	সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	জামাতা, (রেণুকার স্বামী)
১৯০৮	হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯১০	নীপময়ী ঠাকুর	বৌদি, স্ত্রী মৃণালিনীর শিক্ষিকা
১৯১৩	জানকীনাথ ঘোষাল	ভগ্নীপতি
১৯১৫	বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	দাদা
১৯১৬	শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাগ্নের মেয়ে
১৯১৮	ইরাবতী মুখোপাধ্যায়	ভাগ্নি, বাল্যসখী
১৯১৮	মাধুরীলতা চক্রবর্তী	জ্যেষ্ঠ কন্যা

[1] পারিবারিক আত্মীয় বিয়োগের তালিকা – সূত্র: ৬-ই অগস্ট, ২০১৬-র আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত নিবন্ধ

১৯১৯	জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	দাদার মেয়ের ছেলে, শৈশবে কবিতার দীক্ষাদাতা
১৯১৯	সুকেশী ঠাকুর	ভ্রাতুস্পুত্রের স্ত্রী
১৯২০	শরৎকুমারী মুখোপাধ্যায়	দিদি
১৯২০	সৌদামিনী গঙ্গোপাধ্যায়	দিদি
১৯২২	তিভাসুন্দরী চৌধুরী	ভাগ্নি
১৯২২	সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	দাদা
১৯২৩	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	দাদা
১৯২৪	আশুতোষ চৌধুরী	ভাগ্নির স্বামী, বন্ধু
১৯২৪	বিনয়িনী চট্টোপাধ্যায়	বেয়াই (প্রতিমা দেবীর মা)
১৯২৫	হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়	ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৯২৫	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	নতুন দা
১৯২৬	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বড় দাদা
১৯২৯	অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯২৯	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	অবনীন্দ্রনাথের জামাতা, কবির প্রিয়পাত্র
১৯২৯	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩২	নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	নাতি
১৯৩২	স্বর্ণকুমারী দেবী	দিদি
১৯৩৩	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	ভাগ্নে
১৯৩৫	কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৫	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৭	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৮	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	খুড়তুতো ভাই
১৯৪০	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভ্রাতুষ্পুত্র

উদাসী মন

যদি কখনো অগণিত তারার মেলায়
একাকী সময় কাটে
যদি মেঘলা ক্ষনে অভিমানী কিছু অনুভূতি
বিষন্ন হৃদয়ে জেগে ওঠে
তবে বুঝে নিও আমি নিঃসঙ্গ
পাখিরা ফিরে যাবে পথ চিনে নিজ নীড়ে
আমারই শুধু থাকবেনা পথ চেনা
বেদনাকে নিয়ে সচ্ছলতার ঘরে
শর্তবিহীন দুহাত বাড়াব আমি
জানি দুঃখের প্রহার সুখের ছোঁয়ায়
জীবন অনেক দামি
ধ্রুবতারার ওই যন্ত্রনাময় চোখে
মেঘবালিকার নীল আঁচল খসে পড়ে
জেগে থাকা ওই ঝাউয়ের শাখে শাখে
চাঁদের আলো লুকিয়ে শুধু ঝরে
হঠাৎ কখন উদাস হাওয়া
থমকে দাঁড়ায় আমার পাশে
হারিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়ে যায়
তারার ভিড়ে নিরুদ্দেশে

- পার্থ সেনগুপ্ত
২৮.০৪.১৬

ক্যানভাস

গল্প এখন স্মৃতির পাতায়
ধুলোমাখা ছবি মাটিতে লুটায়
সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে
ছোট্টবেলার দিন হারিয়ে
কান্নাভেজা জলছবিতে
বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে
রং-তুলির এই ক্যানভাসেতে
হঠাৎ ওঠে উতল হাওয়া
সাঁঝবেলার ঐ বিষন্নতায়
আমার চোখে অশ্রুধোয়া
হয়ত আজও অসাবধানে
স্বরলিপির গানের খাতায়
নীরব স্মৃতির বিন্দু ঝরে
না-বলা সেই ব্যাথার কথায়
জানলাখোলা স্বপ্নঘরে
হারিয়ে গেছে গানের চাবি
ব্যস্ত জীবন শুধুই কোলাজ
স্বপ্ন শুধুই ধূসর ছবি

- পার্থ সেনগুপ্ত

২৬.৪.১৬

মায়ের জন্ম

মা হয়েছিস বলে মা তোর - এত দেমাক বুঝি
আমি তবে কম কিসে যাই - বলছি সোজাসুজি
খুকু-দিদি, মনি-মাসি কাকা মামা সবার
তোকে ফেলে আমায় কেন আদর করে তারা॥

অফিস থেকে ফিরে বাবা - আমায় কেবল রোজই
আদর করে নেয় মা কোলে - করে না তোর খোঁজই
তুই ও ভীষণ - দুষ্টু মেয়ে - ওদের সাথে পেরে
লজ্জা কেন দিস মা আমায় আদর করে করে॥

যেদিন আমি জন্ম নিলাম - গভীর আঁধার রাতে
তোর ও তো মা জন্ম হল তারই সাথে-সাথে
সেদিন আমি না এলে তুই "মা" হতি কি করে
আগে আমার জন্ম হল "মা" হলি তুই পরে॥

মিথ্যে কেন করিস দেমাক মা হয়েছিস বলে
আমি তোকে "মা" করেছি - এসে মা তোর কোলে॥

Sudeep Biswas
কলিকাতা

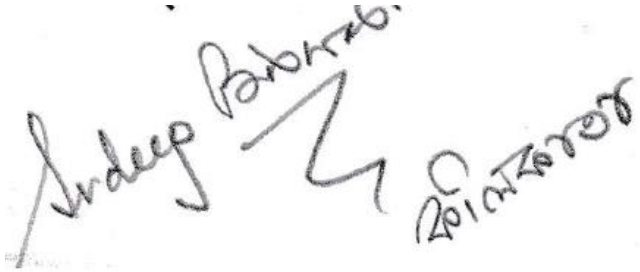

বাঙালী রান্নার তিন কাহন

সুমিত্রা গুপ্ত

আমার রান্নার হাতেখড়ি বিয়ের পরে শশুরবাড়িতে গিয়ে। আমার জায়েরা রীতিমত হাতে ধরে আমাকে রান্না করা শিখিয়েছিলেন। এই দীর্ঘ ৮৮ বছরের জীবনে অনেকের কাছ থেকে অনেক রকমের রান্না শিখেছি। তার মধ্যে থেকেই কয়েকটার কথা নিয়ে আমার রান্নার তিন কাহন।

এক - শুক্তনি

তিতে দিয়েই আমরা খাবার শুরু করি। আর ভাতের সাথে প্রথম পাতে যদি শুক্তনি থাকে তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আলু, কুমড়ো, কাঁচকলা, উচ্ছে, ডাঁটা, বেগুন, থোর, বড়ি দিয়ে আমরা সাধারণত আমরা শুক্তনি করে থাকি।

শুক্তনি করার জন্য কড়াইয়ে সরষের তেল চাপিয়ে তাতে দুটো তেজপাতা, অল্প সরষে আর রাধুনি ফোড়ন দিয়ে তারপর তাতে আলু, কুমড়ো,

কাঁচকলা, বেগুন, থোর, ডাঁটা ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দিতে হবে। তারপর তাতে পরিমাণমত নুন আর আদা বাঁটা দিয়ে তরকারি গুলো ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভাজতে হবে। তরকারি গুলো আধ-সেদ্ধ হয়ে গেলে তাতে অল্প জল দিতে হবে। ভালোমত সেদ্ধ হয়ে গেলে নামানোর সময় অল্প উচ্ছে আর বড়ি আলাদা আলাদা করে ভেজে তরকারির মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তারপর অল্প সরষে আর রাধুনি বেঁটে অল্প দুধের মধ্যে গুলে তরকারির মধ্যে দিয়ে অল্প একটু চিনি দিয়ে ভালোমত মিশিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, শুক্তনি তৈরী।

দুই - তরকারির খোসার কচুরি

আজকাল যা দুরমুল্য বাজার, তাতে কোনোকিছুই ফেলার না। তরকারির যা দাম তাতে তরকারির খোসাটা ফেলে দেওয়াও যেন বাহুল্য। এই খোসা দিয়ে যদি কচুরির মত সুস্বাদু কিছু বানিয়ে ফেলা যায়, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

তরকারির খোসা দিয়ে কচুরি বানানোর জন্য আলু, পটল, কাঁচকলা - সমস্ত তরকারির খোসা কুচি করে কেটে তাতে পরিমাণমত ছোলার ডাল দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর সেই ছোলার ডাল আর খোসা বেঁটে নিয়ে সরষের তেলের ভিতরে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা বাটা দিয়ে কষে তার মধ্যে বাঁটা ডাল আর খোসা দিয়ে নুন এবং মিষ্ঠি পরিমাণমত দিয়ে নিতে হবে।

ভালো করে কষা হলে সেটাকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

তারপর ময়দা নিয়ে তাতে ময়ান ও নুন দিয়ে ভালো করে মেখে তার মধ্যে একটু খাবার সোডা দিতে হবে। এবার তার মধ্যে অল্প অল্প করে জল দিয়ে ভালো করে ময়দাটাকে মাখতে হবে। মাখা হয়ে ময়দার ছোট ছোট নেচি করে তার মধ্যে আগে থেকে করে রাখা অল্প একটু পুর দিয়ে বেলে নিতে হবে। এরপর কড়াইয়ে একটু বেশি করে সাদা তেল নিয়ে গরম করে, ডুবো তেলে সেগুলোকে ভাজতে হবে। ব্যাস তৈরী হয়ে গেল খোসার কচুরি। গরম গরম আলুর তরকারির সাথে পরিবেশন করলে বেশ ভালোই লাগবে।

তিন - নারকেলের মনল্লা

আজকাল ডায়াবেটিসের চাপে বাঙালীর মিষ্ঠি খাওয়া প্রায় উঠেই গেছে। এখন খাওয়ার শেষ পাতে মিষ্ঠির জায়গা নিয়েছে নানারকমের ওষুধ। তবে মিষ্ঠিপ্রিয় বাঙালীরা এর মাঝেও ডাক্তারের কড়া বারণ উপেক্ষা করে মিষ্ঠির ডাকে। আমার শশুরবাড়ির দেশের এমনই একটি প্রসিদ্ধ মিষ্ঠি নারকেলের মনল্লা।

নারকেলের মনল্লা বানানোর জন্য নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে নারকেলের তিন ভাগের এক ভাগ চিনি দিয়ে কড়াইয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। চিনি গলে গেলে ওই নারকেলের ভিতরে নারকেলের অর্ধেক পরিমাণ গুড়ো দুধ দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নেড়ে অল্প নরম থাকতে থাকতে নামিয়ে নিতে হবে। ঠাণ্ডা হলে সেগুলোকে ছোট ছোট গোল্লা পাকিয়ে ঘন দুধে অল্প ময়দা গুলে তার মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে ডুবো তেলে ভাজতে হবে।

এরপর আরেকটা পাত্রে চিনির মধ্যে অল্প জল দিয়ে উনুনে চাপিয়ে ঘন রস করতে হবে। রসটা আঠা আঠা হয়ে এলে তার মধ্যে ভাজা গোল্লা গুলো দিয়ে ভালোমত নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিতে

হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন সবকটা গোল্লার গায়ে ভালোমত চিনির রস লাগে। তাহলেই তৈরী নারকেলের মনল্লা।

বাজল তোমার আলোর বেণু

মা আসছেন। আবার চারিদিকে সাজ-সাজ রব, সকলের মনে আনন্দ। দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষার পর দেবী দুর্গার ধরণীতে আগমন! সকলের মনে আনন্দের বান এসেছে। প্রকৃতিও খুশিতে নৃত্য করছে -- "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি" ।

কিন্তু কেরালা বাসীদের মনে আজ আনন্দের বান নেই। সেখানে আজ জলের বান নেমেছে - কেরালা আজ বন্যাগ্রস্ত। দুঃখে শোকে কেরালা আজ জর্জরিত। সেখানে প্রকৃতি আজ তান্ডবরূপ ধারন করেছে, প্রচন্ড বন্যায় হাজার-হাজার মানুষ, পশু-পক্ষী,জীব জন্তু মারা গেছে। জলের স্রোতে বাড়ি ঘরদোর সব ভেসে গেছে। তারা আজ অসহায়, অবলম্বনহীন, অনাথ।

'মা' গো, কোথায় তোমার 'আলোর বেণু'? শস্য শ্যামলা কেরালা আজ অন্ধকারময়। তুমি তো 'মা' জগৎজননী, অভয়দায়িনী, বিপত্তারিণী, শক্তিরূপিণী। কেরালাবাসীকে আজ অভয় দান করো, বিপদ থেকে রক্ষা করো, শক্তি দান করো। তারা যেন তোমার কৃপায় আশীর্বাদে মনে বল ও শক্তি পায়।

হে কেরালাবাসী, সাহস অবলম্বন করো, ধৈর্য্য ধরো, পুনরায় শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠো। এই দুঃখের সময় তোমাদের সাথে আমরা রয়েছি। অন্তর থেকে সহানুভূতি রইলো।

পুনরায় তোমাদের ঘরে ঘরে আলোর দ্বীপ প্রজ্বলিত হোক এই প্রার্থনা করি।

জয় মা দূর্গা দুর্গতিনাশিনী, তোমার জয় হোক।

- স্বপ্না রায়

Artist: ***Arup Ghosh***

Artist: ***Srijan Baag, 9 years***

অনন্ত-আহ্বান

করবী বাগচী

বিশাল এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহে ও ঝলসানো দীপ্তিতে চারদিক উদ্ভাসিত করে গনগনে উত্তাপে দীর্ঘকাল নিজেকে দগ্ধ করতে লাগলো ।তারপর সেই গহন ঘন উত্তপ্ত অবস্থার ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটল ও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে তাপ নিঃশেষিত হয়ে হিমশীতল কঠিন হয়ে উঠল ।ধীরে ধীরে হিমযুগের অবসান ঘটলে সেই বরফগলা জলে নিমজ্জিত অবস্থায় রইল দীর্ঘকাল ।ধীরে ধীরে দেখা দিল সেখানে প্রাণের স্পন্দন ।জলের উপর জেগে উঠল নানা স্থানে কঠিন প্রস্তর বা মৃত্তিকায় গঠিত শুকনো ভূমি ,জেগে উঠল ক্ষীণ প্রাণের ইশারা চারদিকে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মা গভীর মনোযোগে নিজের সৃষ্টি পৃথ্বীগ্রহকে নিরীক্ষণ করছিলেন ।তাঁর চোখের পলকের সাথে ঘটে যাচ্ছিল পৃথিবীর যুগ-যুগান্তর ।গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পেলেন বড় বড় মহীরুহ ,বৃক্ষ ,নদী ,সমুদ্র ও ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণা ধরিত্রী আর তার মাঝে বিচরণশীল বিভিন্ন আকৃতির দ্বিপদ ,চতুষ্পদ প্রাণী ও সরীসৃপকে ।শুধু তাই নয়, আকাশে উড্ডয়নশীল এবং গভীর ও স্বল্প জলে বিচরণশীল বিভিন্ন ধরণের প্রাণী ও দেখতে পেলেন তিনি ।নিজের সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে থাকলেন স্রষ্টা ।এতোদিন তিনি দেবতা ,অসুর ও মুনি-ঋষিদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবেই সন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু এই পৃথ্বীগ্রহ সৃষ্টি করার পর আজকাল তাঁর মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইচ্ছা জেগে উঠেছে এমন একটি প্রাণী সৃষ্টি করার যারা দেবতাও নয় অসুরও নয় ,কিনতু যাদের মধ্যে এই দুই সম্ভাবনার বীজই লুক্কায়িত থাকবে ।নিজের মনের এই অদ্ভুত ইচ্ছার গতিকে কিভাবে চালিত করবেন এই চিন্তায় বিভোর ব্রহ্মদেবের শরীর

থেকে অকস্মাৎ-ই প্রকট হলো এক মূর্তি যার আকৃতি অনেকটাই ব্রহ্মার অনুরূপ ।নিজ শরীর থেকে উৎপন্ন এই পুরুষ আকৃতিতে সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ মন স্থির করলেন এবং সেই আকৃতির অনুরূপ এক নারী-আকৃতি ও তৈরি করলেন আর এদের নাম রাখলেন স্বয়ম্ভু মনু ও শতরূপা ।
ব্রহ্মার দেওয়া দায়িত্ব মাথায় নিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও শেষপর্যন্ত মনু তাঁর পত্নী শতরূপাকে সংগে নিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছান ।মনু ও শতরূপাকে তাঁর মনের কল্পনাকে রূপায়নের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে ধ্যান-মগ্ন হন পিতামহ ব্রহ্মা ।

অনেক বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছান মনু ও শতরূপা ।

পূর্ণযৌবনা ধরিত্রীর প্রকৃতিকে নিজে শতরূপে সাজানোর দায়িত্ব নিয়ে আসা শতরূপা সেই দায়িত্ব পালন করতে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় চারদিকে । অপরূপ সাজে প্রকৃতিকে সাজিয়ে সে প্রতীক্ষায় থাকে মনুদেবের এসে পৌঁছানোর ।এই নতুন গ্রহের জলের স্থলের সমস্থ প্রাণীদেরে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে মনু এসে পৌঁছালেন ধরিত্রীতে ,দেখলেন সুসজ্জিতা প্রকৃতি নানা ভাবে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে । কোথাও পর্বতশ্রেণী সগর্বে মাথা তোলে আকাশ ছুঁতে চাইছে; কোথাও অশেষ জলরাশি ভীম-গর্জনে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ছে পর্বতের সানুদেশে-অহংকারমত্ত পাহাড়কে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিজের অথৈ জলরাশির সংগে মিশিয়ে নেওয়াই যেন তার প্রতিজ্ঞা । অন্যপ্রান্তে হিমযুগের স্মৃতি বহন করে সুদীর্ঘ ভূমি নিজেকে শ্বেত আভরণে ঢেকে কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে দিনের পর দিন । আবার কোথাও সুদীর্ঘ বৃক্ষ চারদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীকে আঁকড়ে ধরে ।কোথাও সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘ বালুকাময় ভূমি শুষ্ক উষ্ণ হাহাকারে নিজের এই নিষ্ফলা জীবনের অভিশাপের কারণ যেন জানতে চাইছে সৃষ্টিকর্তার কাছে ।আনমনা মনু হেঁটে চলেছেন পৃথ্বীর বুকে ,গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন ধরিত্রীর নিজ সন্তানদেরে ।প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে যে প্রাণের লক্ষণ ধরিত্রীর বুকে মমতার অমৃত নিঃসরণ ঘটিয়েছে , সেই নিয়মই তার বুকে সৃষ্ট জীবদেরে যেমন অন্যদের ভক্ষক করেছে তেমনি নিজেকে রক্ষা করার অস্ত্র ও সাজিয়ে দিয়েছে

তাদের শরীরে ।স্বয়ম্ভু গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করছেন আর বারবার হতাশ হয়ে পড়ছেন বিভিন্ন ভূচর ,জলচর ও উড্ডয়নশীল প্রাণীদের দেখে । মনকে প্রবোধ দিয়ে আবার এগোচ্ছেন সামনের দিকে ।এমন কোন ও প্রাণী কি নেই যার আকৃতির সংগে মনুর সাযুজ্য আছে! দীর্ঘ দিন অন্বেষণের পর হতাশ মনুদেব অকস্মাৎ-ই আশ্চর্যান্বিত হয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন সামনে । অদৃশ্য তিনি তাই সেখানকার দ্বিপদ প্রাণীরা তাঁর আবির্ভাব অনুভব করতে পারলনা ।এতোক্ষণে তিনি দেখতে পেয়েছেন দ্বিপদ কিছু প্রাণীকে যদিও তারা অনেকটাই খর্বকায় ।শুধু তাই নয় দীর্ঘ কেশে আবৃত তাদের মুখমণ্ডল এবং শরীরের অন্যান্য অংশ ।তাদের মধ্যে নারীও ছিল যাদের শরীরে কেশ থাকলেও মুখে তার পরিমান অনেকটাই কম ।অতি সামান্য মিল হলেও আশান্বিত হলেন মনু ।দীর্ঘ সময়ের নিরীক্ষণে তিনি দেখলেন এই প্রাণীদের অন্য প্রাণীদের মতো নিজেকে রক্ষা করার জন্য শরীরে কোন জন্মসূত্রে পাওয়া দীর্ঘ নখ ,দন্ত বা শৃঙ্গ নেই ; নেই অতি দ্রুত গতি বা অপরিমেয় শারীরিক শক্তি ,তবুও সম্ভঃবত প্রকৃতি-প্রদত্ত বোধশক্তি ওদের প্রবল আর তারই সাহায্যে ওরা নিজেকে রক্ষা করতে হাতে তুলে নিয়েছে প্রস্তর খণ্ড ,খোঁজে বের করেছে সেই আকৃতির প্রস্তর যার সাহায্যে নখী-দন্তী-শৃঙ্গীদের হাত থেকে নিজেদেরে রক্ষা করার চেষ্টা সম্ভব হবে ।

উৎফুল্ল মনু ফিরে চললেন নিজ আলয়ে ,নিজের মনে সিদ্ধান্ত নিলেন এই দ্বিপদ প্রাণীকে পরীক্ষার মাধ্যমে নিজ সন্তান-রূপে গ্রহণ করার ।এরাই হয়তো হবে মনুর সন্তান মানব –মনুষ্য ।প্রকৃতি-প্রদত্ত বোধের সংগে যোগ হবে মনু-প্রদত্ত চেতনা ও জ্ঞান । এইভাবেই ব্রহ্মার সৃষ্ট এই ধরিত্রীর শতরূপা প্রকৃতি ও মনুর চেতনা ও জ্ঞানে সৃষ্ট মানব একদিন তার বোধের উৎকর্ষ লাভ করে নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করবে আবার এই মানবই হয়তো তার দেওয়া বোধের নিকৃষ্ট প্রয়োগে নিজেকে অসুরত্বে প্রকট করবে ।

আত্মরক্ষার্থে প্রস্তর হাতে তোলে নিলেও এই ভবিষ্যৎ মানবরা প্রাণের উৎপত্তির কারণ উপলব্ধি করতে অপারগ । সাধারণ পশুদের মতই দেহসম্ভোগের কামনা তাদের মাঝে মাঝেই প্রবল হয়ে উঠে আর সেই মিলনও তাদের পশুদের মতই নির্লজ্জ আদিম ।আর এই মিলনের

ফলস্বরূপই যে নারী মাতৃত্ব লাভ করে ,সেই বোধ তাদের নেই ।তাই তারা নারীর স্ফীতদোরা ও বিশাল পয়োধরা রূপ দেখে ভীত হয় ।দৈহিক এই পরিবর্তনের সংগে সন্তান জন্মের কোন সংযোগ তারা উপলব্ধি করতে পারেনা ।কিন্তু কোন এক অজানা কারণে স্তন্যদানরতা মা-কে তারা সমীহ করে ,তাকে নিজ খাদ্যের ভাগ দিয়ে কৃতার্থ হয় ।

এই ভাবী মানবরা নিজেদের জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সর্বদাই স্থান বদল করে ।মনু দেখলেন শতরূপার সাহায্যে প্রকৃতি তার সমস্ত সন্তানদেরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজেকে নানা ভাবে সাজিয়েছে ।গহন অরণ্যে যেমন আশ্রয় নিয়েছে বিশাল বিশাল হিংস্র প্রাণীরা ,অন্য প্রাণীরা ও তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য জলে ,জঙ্গলে ,গুহায় ,বৃক্ষের উপরে নিজেদের আশ্রয় গড়ে নিয়েছে ।মনুদৃষ্ট এই ভবিষ্যৎ মানবরা ও বেঁচে থাকার তাগিদে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে ও গুহায়।

অস্থির মনু আর একবার পরিক্রমণ করলেন পুরো পৃথিবীগ্রহকে ।চেতনা ও জ্ঞান প্রদান করার আগে তাঁকে আরো অনুসন্ধান করতে হবে ।কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হলেন তিনি ,নিজ আকৃতির সংগে সামান্যতম মিলও তিনি অন্য কোন প্রাণীতে পেলেন না ।তাঁর মনে দ্বিধা-যে মহার্ঘ দান তিনি করতে চলেছেন তার যথাযোগ্য ব্যবহার কি করতে পারবে এই দ্বিপদ প্রাণীরা ?দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে মনু আবার এসে পৌঁছালেন এই প্রাণীদের পাশে ।ক্লান্ত চেহারায় ফুটে উঠল তাঁর আশ্চর্য এক হাসি ।তাঁর অনুমান ব্যর্থ হয়নি ,শুধু প্রকৃতির দেওয়া বোধেই ওরা এগিয়ে গেছে অনেকদূর ।শুধু নিজেদের রক্ষা করার প্রয়াস থেকেই ওরা অনুভব করেছে অগ্নির মহিমা ।ওরা দেখেছে প্রচণ্ড বর্ষণে আকাশের বজ্র যখন পৃথিবীতে নেমে এসে বৃহৎ বৃক্ষগুলি জ্বালিয়ে প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করে তখন বনের প্রাণীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় দূরে।হয়তো দীর্ঘ দিন দূর থেকে পর্যবেক্ষণের পর একসময় ধীরে ধীরে আগুণের তাপ কমে এলে ওরা দল বেঁধে এগিয়ে গেছে সেই আগুণের সামনে ,অপার কৌতূহলে হাতের পাথর দিয়ে স্পর্শ করেছে সেই অগ্নি ।আর এইভাবেই একদিন আবিষ্কার করেছে আগুণ জ্বালানোর পদ্ধতি ।স্বয়ম্ভু বুঝতে পারেন

সময় হয়েছে এবার ওদেরে বোধের সংগে চেতনা ও জ্ঞান প্রদান করে সম্পূর্ণ মানব হওয়ার সুযোগ দেওয়ার ।

ব্রহ্মাকে স্মরণ করেন মনু, তাঁর মনে হয় ব্রহ্মদেব তো সবাইকে নয় ,শুধু তাঁকে আর শতরূপা প্রকৃতিকেই দায়িত্ব দিয়েছেন পৃথিবীর প্রাণীকে মানব-রূপে গড়ে তুলতে ।তিনি তাহলে নিশ্চিত না হয়েই পুরো দ্বিপদ প্রাণীদেরেই কী করে দান করবেন চেতনা ও জ্ঞান ।মন স্থির করলেন তিনি ,বেছে নিলেন চারটি সদ্যোজাত শিশুকে ,অসীম স্নেহে নিজ পুত্র-কন্যা-তুল্য ওদেরে দান করলেন চেতনা ও জ্ঞানের ঐশ্বরিক সম্পদ ।এখন তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনের যেদিন এই জ্ঞানের অংকুরকে গ্রহন করে নিজেদের চেষ্টায় মহীরুহে পরিণত করে সৃষ্টিকর্তার দিকে মাথা তোলে ডাক দিতে পারবে এই শিশুরা ।যদি সার্থক হয় তাঁর এই চয়ন তবে একদিন এদেরই কাছ থেকে ওদের সংগীদের ও ঘটবে জ্ঞান-চেতনার উন্মেষ-সৃষ্টি হবে মানবজাতি ।

এই শিশুদের দুটি পুরুষ দুটি নারী ।মনু এদের নাম রাখলেন আকাশ ,অরণ্য ,বৃষ্টি ও নিশা ।ফিরে গেলেন মনু দীর্ঘ দিনের জন্য ।

কালের পরিক্রমায় বেড়ে উঠছে চার শিশু ।যতোদিন নিজ পায়ে হেঁটে চলতে পারেনা ততদিনই মা তাদের খেয়াল রাখে ,তারপরই শুরু হয় তাদের জীবন-সংগ্রাম ।নিজেদেরই খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব নিজেদেরই ।কিশোর আকাশ ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিকে মাটিতে ফেলামাত্রই ছুটে এসে সেই পাখিকে নিয়ে পালিয়ে যায় অরণ্য ।ছুটে আসে নিশা ,প্রচণ্ড হিংস্রতায় আঘাত করে অরণ্যকে ,ছুঁড়ে ফেলে গভীর জলে সেই মৃত পক্ষী ।ব্যথিত আকাশের পাশে ছুটে আসে বৃষ্টি ,নিজের হাতের বন্য ফল তোলে দেয় আকাশের হাতে ।

দিন এগিয়ে চলে, পৃথিবী ঘুরে আসে সূর্যকে অনেকবার ।বিভিন্ন ঋতু তাদের নিজস্ব নিয়মে কখনও প্রচণ্ড দাবদাহে জ্বালিয়ে দেয় ধরণীকে ,আবার কখনও প্রচণ্ড বর্ষণে সেই দাবদাহের জ্বালা মুছিয়ে দিয়ে শীতল করে ধরণীকে ।কখনও জলহীন মেঘ বাতাসের সাহায্যে নানা আকৃতি ধারণ করে ধরিত্রীকে মুগ্ধ করার খেলায় মেতে উঠে আবার কখনও হিমশীতল বায়ু প্রচণ্ড আক্রমনে কাঁপিয়ে দেয় ধরিত্রীকে ।সহিষ্ণু প্রকৃতি সব কিছুর পরও নিজেকে আবার সাজিয়ে তোলে রঙীন ফুলে ,বাহারি

পত্রে আর সেই পত্র-পুষ্পে সজ্জিত বৃক্ষকোটর থেকে বেরিয়ে আসা পাখিরা তাদের মধুর স্বরে প্রকৃতির স্তব করে গানে গানে ভরিয়ে তোলে চারদিক ।হেসে ওঠে রঙীন পৃথিবী ।

আবার পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়ান মনু ।তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায় শতরূপা প্রকৃতি ,নীরবে যেন অনুরোধ জানায় মনুকে ,যে জ্ঞান-চেতনার বীজ তিনি রোপন করে গেছেন শিশুদের অন্তরে তার বিকাশ কতোটা হয়েছে তার খবর নিতে ।হাসি মুখে এগোন মনু ।সামনেই বিশাল নদীর পারে শুকনো ঘাস পাতায় গড়া গোল গোল কুটীর দেখে স্থির হয়ে যায় তাঁর পদদ্বয় ,অবাক হয়ে দেখেন শুধু কুটীরই নয় ,তার পাশে গাছের ডাল কেটে আগুন জ্বালিয়ে তাতে মৃত প্রাণীর মাংস ঝলসাচ্ছে এই দ্বিপদ প্রাণীরা ।আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন মনু ।তিনি আরও দেখতে পান এই প্রাণীরা শুধু স্বভাবগত ভাবে নয় ,তাদের অবয়বে ও ঘটে গেছে অনেক পার্থক্য ।সম্ভবতঃ অগ্নি-ঝলসানো পশুমাংস সহজপাচ্য হওয়ায় তাদের চোয়াল ও দাঁতের কাজ কমে যাওয়ায় চোয়াল ও দাঁতের আকৃতি বদলে গেছে আর ওদের মুখাবয়বে এসেছে লাবণ্য ।জলচর প্রাণীকে মেরে খাদ্যে পরিণত করার শিক্ষাও ওরা পেয়েছে বিভিন্ন পশু ও পক্ষীদের কাছে আর তার ফলে নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা অবগাহন স্নানে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে ,শিখেছে সন্তরন ,যার ফলে তাদের দেহের ক্লেদ ,অপরিচ্ছন্নতা অনেকটাই দূর হয়েছে ।

মনুদেব খোঁজে চলেছেন তাঁর সেই চার শিশুকে ।তিনি জানেন আজ আর তারা শিশু নয়,প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতী ।নিজের অজান্তেই তিনি এসে পৌঁছান নদীর ধারের সেই কুটীরগুলোর সামনে ।আশ্চর্য হয়ে দেখেন সবগুলোতেই সদ্যোজাত শিশু ও বুড়োদের রাখা হয়েছে ।কুটীর নির্মাণ করা হয়েছে পাখিদের অনুকরণে কিন্তু তাতে অপর্যাপ্ত আলো ও হাওয়া যাতে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।শিশুদের আকৃতিও অনেকটাই পরিবর্তিত ।মনুদেব আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন তাঁর দেওয়া জ্ঞান ও চেতনার অংকুর এতোটাই কী বৃদ্ধি করতে পেরেছে চার শিশু যে সমস্ত দ্বিপদ প্রাণীরা এবং তাদের নবজাত সন্তানরাও সেই জ্ঞান-চেতনার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে!

দলের সংগে এগিয়ে চলেছে আকাশ ,বৃষ্টি ,অরণ্য ও নিশা ।বৃদ্ধ ও প্রসূতিকে কুটীর বানিয়ে রেখে এসেছে ওরা ,জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষার জন্য দিয়ে এসেছে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে ।প্রচণ্ড দাবদাহে পথ চলা কঠিন হয়ে পড়েছে ।সহজাত বুদ্ধিতে ওরা জেনেছে প্রচণ্ড দাবদাহের পরই আকাশ ভেঙে নামবে অঝোর জলধারা ।তাই দলবল নিয়ে ওরা বেরিয়েছে শিকারের খোঁজে ।দীর্ঘ এই বৃষ্টির দিনগুলোর জন্য ওদের প্রয়োজন অনেক খাদ্যের ।তাছাড়া খোঁজে বের করতে হবে কিছু বড় আকৃতির নতুন গুহাও ,কারণ শিশুরা বড় হচ্ছে-বর্ষায় সকলেরই আশ্রয় দরকার ।আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো কাঠ ,ওদের সমস্ত পাথরের অস্ত্র , সবকিছুই গুছিয়ে রাখতে হবে কারণ বন্য প্রাণীরাও খাদ্যের অন্বেষণে এই সময় হিংস্র হয়ে উঠে ।

সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখন যেনো গাছের শুষ্ক-বল্কল টেনে নিয়ে শরীরের উপর জড়িয়ে নিয়েছে এই দ্বিপদরা । শুধু তাই নয় অনেকেই গাছের বড় বড় পাতা ছিঁড়ে মাথা আবৃত করেছে ।মনু দেখেন তাঁর দেওয়া জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগে পরিপূর্ণ মানব হয়ে উঠতে আর বেশি দেরী নেই এদের।

কিছুকাল তপস্যায় অতিবাহিত করে আবার ধরায় অবতীর্ণ হন মনু ,মনে গভীর আগ্রহ-এবার কী নতুন জ্ঞানের পরিচয় পাবেন তাঁর মানব সন্তানদের ।বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসে আছে আকাশ ,সামনে প্রশস্ত পাথরে গড়া পাহাড় উপরের দিকে ধাপে ধাপে উঠেছে ।আকাশের পাশেই রাখা লম্বা ,চেপ্টা নানা আকৃতির ছোট বড় পাথর ।অনতিদূরে আরেকটি পাথরে ফুলে-পত্রে নিজেকে সাজিয়ে বসে আছে বৃষ্টি ।আকাশ গভীর দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ নিরীক্ষণ করে বৃষ্টিকে- তারপর হাতের লম্বা সরু পাথর সামনের বিস্তৃত পাথরের পাহাড়ের গায়ে বসিয়ে অন্য হাতের পাথর দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করতে থাকে ।মনু চোঁখ ঘুরিয়ে খোঁজতে থাকেন অরণ্য ও নিশাকে ।অচিরেই তাঁর দৃষ্টি আবিষ্কার করে অরণ্যকে ।ক্রুদ্ধ পশুর মত নগ্ন শরীরে অদূরে একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে-ক্রূর চোখদুটো তার বৃষ্টির দিকে নিবদ্ধ ।নিশাকে দেখতে পান জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে বেরিয়ে আসতে ,চোখে তার এক অমানবি জান্তব উল্লাস ।মনু আশ্চর্য হয়ে ভাবেন

চারজন শিশুকে তো তিনি সমভাবেই দান করেছেন জ্ঞান-চেতনার বীজ ,তাহলে এদের আচরণ এতো দুর্বোধ্য কেন?এই প্রশ্নের জবাব চাইতে তিনি পৌঁছে গেলেন ব্রহ্মার কাছে ।প্রশ্ন শোনে স্মিতহাস্যে সৃষ্টিকর্তা মনুকে আরেকটি প্রশ্ন করলেন-'স্বয়ং ব্রহ্মা নিজহস্তে দেবতা ও অসুরকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তাদের স্বভাবে কেন এতো পার্থক্য ?' মনের দ্বন্দ্বের অবসান হলো ,মনু বুঝতে পারলেন জ্ঞানের স্রোত নদীর মতো-সে স্রোতে যেমন অজস্র প্রাণীর বাস তেমনি সেই স্রোতই অনেক প্রাণীর প্রাণ হরণ ও করে ।তার ভয়ংকর গতিকে যদি কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তবে সে তার জলধারায় বাঁচিয়ে তোলে শুষ্ক ভূমিকে ,তার উদ্ভিদকে ,ভূচর প্রাণীদেরকে ।

দুই দীর্ঘ শৈত্যকাল কেটে যাওয়ার পর এবার আবার সেজে উঠেছে প্রকৃতি মধুমাসের আগমনে ।পাথরের বুকে নিজ হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলা বৃষ্টির মূর্তির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায় আকাশ । দুই হাতের অঞ্জলি ভরে অজস্র ফুল সে নিয়ে এসেছে বৃষ্টিকে দেবার জন্য ।ভালবাসা ব্যক্ত করার ভাষা ওর মুখে নেই কিন্তু সেই ভালবাসা প্রদর্শন করার ক্ষমতা সে আজ লাভ করেছে ।অন্তরের গভীরে সে বৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে আর বৃষ্টি ও নিশ্চয় এভাবেই তার প্রতি ও আকর্ষণ অনুভব করে নয়তো সে কেন আকাশকে ছেড়ে কারো কাছে যায়না ।বৃষ্টি যখন বর্ষায় অঝোর জলধারায় আনন্দে দুইবাহু মেলে ছুটে যায় তখন সে আকাশকেই তো টেনে নেয় সংগে ।আবার প্রখর শীতে গুহার সামনে অগ্নিকুণ্ডের কাছে সে আকাশের শরীরেই তো উষ্ণতা খোঁজে ।এতো স্পষ্ট হয়তো ছিলনা ভাবনার গতি আকাশের ভাষাহীন মনে ,কিন্তু আবছা হলেও এরকম চিন্তার ছবিই নিশ্চয় জেগে উঠেছিল তার মনে ।

মনু দেখছেন ফুল হাতে আকাশের প্রতীক্ষা ,তৃপ্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন।অকস্মাৎ-ই বীভৎস চিৎকারে চমকে উঠে ছুটে নীচে নেমে এলো আকাশ ,তার হাতের ফুল ছড়িয়ে পরল বৃষ্টির মূর্তির পায়ের কাছে ।দুটি রক্তাক্ত দেহ এনে নামিয়ে রাখা হয়েছে পাহাড়ের নীচে –বৃষ্টি ও অরণ্যের ।বৃষ্টির বুকে আমূল বিদ্ধ পাথরের ছুরি ,রক্তাক্ত অরণ্যের হাত পা বাঁধা বন্য-লতায় ।হিংস্র মুখে অরণ্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অস্ত্র হাতে নিশা ।

বিমর্ষ মনু নিজ আলয়ে ফিরে গেলেও তাঁর মনের অস্থিরতা তাঁকে বাধ্য করল কিছুকাল পরই আবার ধরিত্রীতে ফিরে আসতে ।কপালে দীর্ঘ ভ্রুকুটি নিয়ে নদীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি ।সেখানেই তিনি দেখতে পেলেন অরণ্যকে-সামনের দিকে স্থির তার দৃষ্টি ,আর সেই দৃষ্টিতে ফোটে উঠেছে এক অসহায় করুণ আর্তি ।নিজের গর্হিত কাজের শাস্তি সে নিজেই দিয়েছে নিজেকে ,নির্বাসন বেছে নিয়েছে সে নদীর পারে নিজের জন্য ।শীত ,গ্রীষ্ম ,বর্ষার অনুভূতি ও যেন লোপ পেয়েছে তার ।শুধু নিশা তার ধিক্কার মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে সারাদিন বসে থাকে অরণ্যের পাশে ,খাদ্যের জোগাড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তাকে ।অরণ্যের অপলক দৃষ্টি অনুসরণ করে বিস্ময় ও সার্থকতার আনন্দে অত্যদ্ভুত এক মৃন্ময় আকৃতির দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন স্বয়ম্ভু মনু ।চতুষ্কোণ এই মৃন্ময় স্তূপের চারদিকের মাটী ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে চারটি বিশেষ আকৃতি – নারীশরীরের প্রতীক চিহ্ন-যা ভগবানের দান অমৃত ধারণ করে নারীকে শিশু-খাদ্যের রক্ষক দেবীতে পরিণত করে ।

মনু বুঝতে পারলেন এইভাবেই অরণ্যের মনের তীব্র ভালবাসা বৃষ্টির দেহের প্রতি তার লালসাকে মাতৃদেহের প্রতি অবোধ শিশুর আকর্ষণে পরিণত হয়েছে ,আজ তার দানবীয় সত্বা হার মেনেছে তার ভালবাসার কাছে ।

বৃষ্টির মূর্তির দুইপাশ পাথর দিয়ে ঘেরাও করেছে সবাই মিলে ,বসে আছে সবাই সেই কুটীরের সামনে ।মনু আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন পৃথিবীর বুকে এই কী মানব-সৃষ্ট প্রথম মন্দিরের প্রথম দেবী-মূর্তি?

এই ভাষা হীন মানবরা জানেনা তাদের জীবন কার দান ,সেই জীবনের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার কার হাতে ,কিন্তু তাদের পীড়িত হৃদয় আজ প্রণত হতে চাইছে কোন এক অজানা মহাশক্তির কাছে ।অকস্মাৎ-ই মহাকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করা আকাশের ভাষাহীন মূর্তির মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এক দীর্ঘ আর্ত গভীর স্বর ।তাকে অনুকরণ করে সমবেত জনতা ।সমস্ত পাহাড়ে ,জঙ্গলে ,অন্তরীক্ষে অনুরণিত হওয়া সেই-ও ও-উ উ –ম ম ধ্বনি, মনুর সন্তানদের অন্তরের অন্তঃস্হল থেকে উচ্চারিত হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে অনুরণিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে । মনু বুঝতে পারেন এই ধ্বনিই সৃষ্টির প্রথম

মহামন্ত্র-অনাদি অসীম অনন্তের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র অবলম্বন ।

ব্রহ্মার অর্পিত কাজে সার্থকতা লাভ করে প্রসন্ন মনু শতরূপাকে সাথে নিয়ে চিরতরে ফিরে চললেন নিজ আলয়ে।আজ থেকে এই নশ্বর মনুষ্যরা অমৃতের-সন্তানত্ব লাভ করল-সমাপ্ত হল মনুদেবের কর্তব্য ।

----------করবী বাগচী

Memorable experiences on Bombay's local train.

In my initial days just after my marriage I would travel using the local train almost daily. I would meet many different passengers. Some of them have still held a special place in my memories of those days.

I vividly remember the gentleman I met when I was going to my work one day. The train was very crowded, he looked at me and said, "does the Christian name of my wife start with letter A". Her name is Atrayee, I said 'yes', then he told me some more information that no one but myself should have known. At this point I was very intrigued, but I knew nothing about this man and had never seen him before. He told me he was from Badlapur, near Kalyan, that he meditates regularly and that he was about to retire soon from work. Recently he had realized that he was able to, through intuition, find out things about anyone's past, present and future. He then told me few interesting things that he knew psychically about me. It helped me to realize some of my deepest desires that I wished to achieve, and he gave me confidence in my ability to be successful.

Another person on the train, who was about as old as the psychic gentleman, was a man called Ravishekhar. This man told me that this psychic gentleman rarely talks to anyone on the train, and that he was surprised to see him speaking with me. One-day Ravishekhar told us he is retiring in the month of September from his bank, it was currently August, and that his bank had reimbursed his railway pass till October. We all had our separate passes, he was deliberating whether he should use his pass after his official retirement. He decided to return the remaining one month's first-class fare to the Bank.

Ravishekhar then told us that despite having 30 days of paid leave, he was still coming to work, as he was feeling lethargic at home. Overhearing this, our psychic friend said that coincidentally he was also retiring in September and that his pass expires at the end of September, so he would be buying a normal ticket after this date of he wished to travel.

I remember when we all travelled together on the 30th of September. Ravishekhar was very emotional and said that he would miss us all from tomorrow. So we asked him if he weren't using his pass till it expires. Since that way he could spend some time on train for another month and give us a bit of company, he seemed to be bit reluctant. The rest of us kept on insisting, everyone except our psychic gentlemen, he told us not to force Ravishekhar to do this if he did not want to. Instead he wished Ravishekhar a happy retirement and told him to prepare for a new journey instead of the local train travel. He then shook hands with Ravishekhar and bid him goodbye.

On the first of October we saw Ravishekar in our compartment again, he would normally travel till Dadar. We honored Ravishekhar with a seat and congratulated him for first day of his official retirement life. We asked him what he was planning on doing now, he smiled as usual, and said

that he wished to buy and sell stocks, he then picked up a newspaper, and started reading the editorials in the Times of India.

Our psychic friend didn't come that day. For the first time we felt his absence, as the train rolled on, we went past Sion and Mahim soon we went past Dadar station, but Ravishekhar did not disembark. We did not bother him as he had dozed off. Some of us softly remarked how people get relaxed after retirement.

After reaching the last station; Victoria Terminus, we realized that Ravishekhar hadn't left his seat yet. When one of our co-passengers tried to wake him up, he screamed and told us that Ravishekhar wasn't moving. We thought he may have become unconscious, so we rushed him to a nearby hospital. It seems that he had passed away almost 30 minutes before reaching Victoria Terminus station. Which meant that he died before the train had passed Dadar. So Ravishekhar didn't travel past Dadar for a single day after retirement despite having a full month’s pass.

I wished our psychic friend had elaborated to us, that when he had indicated that Ravishekhar would begin a new journey after retiring it was something he was intuiting about his future. We couldn't decode the unsuspecting advice that he gave Ravishekhar on the 30th of September. Despite the grim ending to my story, I still reminisce about traveling on the Bombay train, there's just something about that experience that I will never forget.

Written by

Pavitra Roy

RELIANZ
GROUP
Relianz
your one stop shop
Travel
Forex
Mortgage
www.relianzgroup.com
Toll Free: 0508 411 111

ARJUN
SUPERMARKET

Kashish

HR Haldiram's

WESTERN UNION WU
moving money for better

Bake & Beans
360° Fresh

ROYAL GOLD

Lotto New Zealand

5 Rankin Ave, New Lynn, (Near Train Station), Auckland
Ph: 09 827 5036 | Email: ankur.mehandroo77@gmail.com

0800 70 70 80